যোগ
বিয়োগ

যোগ বিয়োগ

আশাপূর্ণা দেবী

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৩৬০
প্রকাশক
নির্মলকুমার সরকার
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৭

মুদ্রাকর
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার
ব্লক
টাওয়ার হাফটোন কোম্পানী
মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

দাম দুই টাকা

এক

বিধাতা পুরুষের তুলিতে আঁকা অদৃশ্য ভাগ্যলিপির মতোই, গুটিয়ে রাখা সরু সরু সেলুলয়েডের ফিতের গায়ে মুদ্রিত হয়ে আছে অসংখ্য টুকরো ছবি, মৌন হয়ে আছে অজস্র টুকরো টুকরো কথা। ··· নীরব হয়ে পড়ে আছে রায়বাড়ীর — বহু আশা নিরাশা, আনন্দ বেদনায় গড়া নানা কীর্ত্তিকলাপের ইতিবৃত্ত।

গুটিয়ে রাখা ফিতে খুলে ধরো যেখানে থেকে খুসি, খুলে ধরো তীব্র আলোর মুখে, পর্দ্দার গায়ে ফুটে উঠবে চলমান জীবনচিত্র। নির্ব্বাক ছবি মুহূর্ত্তে মুখর হয়ে উঠবে বিচিত্র ভাষায়···নিমেষে চঞ্চল হয়ে উঠবে বিচিত্র ভঙ্গীতে।

ওই যে পর্দ্দার গায়ে ফুটে উঠেছে রায় বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের 'নেমপ্লেট' আঁকা বিরাট তিনতলা বাড়ীখানা। রাস্তাটা বিশিষ্ট।

বাড়ীখানার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটা উদ্ধত।

সময়টা বিকেল।

বাতাস উঠেছে জোরে। ··· দোতলার বড়োবারান্দায়, গুটি তিনচার ছোট ছেলেমেয়ে মহোৎসাহে ফানুস ওড়াচ্ছে। অবশ্য একটি দলপতি তাদের আছে, সেটি নেহাৎ বালক নয়।

রীতিমত বলিষ্ঠ একটি যুবক।

তার হাতে সাবান জলের পাত্র।

গলার স্বরটাও উদ্দাম হয়ে উঠেছে তারই।

—হচ্ছে না—হচ্ছে না রুণুব হচ্ছে না! আরে ছি ছি!...এ-ই দেবু পেরেছে। বা বা, এ যে রীতিমত একটি ফুটবল রে! আরে আরে দেবু আর বাড়াসনে, ফেটে যাবে। ফুটবল 'ফুট্' হয়ে যাবে একেবারে!...ওই যাঃ হলো তো? নাও আরও বাড়াও? চাঁছু ফের লাফালাফি করছো? ... অমন করলে দেবোনা সাবান জল।

যুবকটির কথার ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের টুকরো কথা শোনা যায়...'গোবিন্দকা দেখো দেখো দাদা আমারটা ফাটিয়ে দিলো!' 'ও গোবিন্দকা আমার নলটা মুচড়ে গেছে আর একটা করে দাও।'

অতএব বোঝা যাচ্ছে যুবকটির নাম গোবিন্দ।

বাতাস উঠেছে জোরে।

বারান্দার ভিতর দিকে ঘরের দরজার দামী পর্দাগুলো ওজন হারিয়ে দুলছে এদিক ওদিক।

এদের উচ্ছ্বসিত কোলাহলের মধ্যে একখানা পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বাড়ীর কর্ত্তা।

রায় বাহাদুর যামিনীমোহন রায়।

দীর্ঘ সম্ভ্রান্ত চেহারা; বছর পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বয়েস, গম্ভীরমুখে প্রসন্নতার আভাস। বেশভূষা চলন বলন সব কিছুতেই একটা বলিষ্ঠ আভিজাত্যের ছাপ।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কৌতুকের স্বর বাজে—কি হচ্ছে তোমাদের?

গোবিন্দ চমকে ওঠে।

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে লজ্জার তানে ঈষৎ জিভ কেটে হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বারান্দার ওপাশে রক্ষিত আরাম কেদারাটাকে টেনে মাঝখানে এনে বলে—মামা বোসো।

যামিনীমোহন বসেন না।

বিশেষ গ্রাহ্যও করেন না ওকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাতি নাতনীদের আনন্দ উৎসব দেখতে থাকেন।

চাঁদু বলে ওঠে—দেখেছো দাদু, দাদাটা কী বোকা! ফানুসগুলোকে যতো ইচ্ছে বাড়াচ্ছে! তাই তো না ফেটে যাচ্ছে?

যামিনীমোহন সহাস্যে বলেন—একা দাদা কেন, দুনিয়ার অনেক লোকই তোর দাদার মতন বোকা, বুঝলি? তোদের এই বুড়ো দাদুটাই বা তার চাইতে এমন বেশী কি চালাক? ফানুসকে যতো ইচ্ছে বাড়ালে যে ফেটে যায় সে বুদ্ধি আর হ'লো কই?

ছোট্ট মণি এগিয়ে এসে আবদার করে বলে—দাদু, তুমি একটা ফানুস ওড়াও না! ও দাদু—

যামিনীমোহন নাতনীর মাথায় একটু আদরের চাপড় মেরে বলেন—ফানুস? দূর, আমি কি ওড়াতে পারি?...আচ্ছা রোস আমি বরং ঘুড়ি ওড়াই। ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করেন এক গোছা খুচরো নোট...দু'টাকার...পাঁচ টাকার · এক টাকার।

—এই দেখো আমার ঘুড়ি! যে যেটা ধরে ফেলতে পারবে সেটা তা'র।

০ ০ ০ ০

গোছা শুদ্ধ নোটকে হাওয়ার মুখে উঁচু করে ধরে হাত থেকে ছেড়ে দেন যামিনীমোহন!...জোর বাতাস লেগে ফরফর করে উড়ে বেড়ায় নোটগুলো।

অলক্ষ্যে দু'খানা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে খানিকটা দূরে গিয়ে ফুটপাথে নেমে পড়ে।

এদিকে বেদম হৈ চৈ সুরু করেছে দেবু রুণু চাঁদু মণিরা।—মজার

ঘুড়ি···মজার ঘুড়ি। দাদু হরির লুট দিচ্ছেন রে!···এই···এই ওটা আমার, আমার হাতেই আগে ঠেকেছিলো।

ধরবার জন্য প্রচণ্ড লাফালাফি করতে থাকে ছেলেরা।

এহেন হরির লুট দেখলে বড়োরাই লাফঝাঁপ করতে চায়, তা' নেহাৎ শিশুরা!

° ° ° °

—আমি দুটো পেয়েছি···দুটো লাল···

—আমি মোটে একটা···দাদু তুমি ধরে দাও। গোবিন্দকা দাওনা ধরে!···কলরব উদ্দাম হয়ে ওঠে।

পাশে আর একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন গৃহিণী সন্তোষিণী!

নিঃশব্দ কৌতুকে কিছুক্ষণ দেখে কর্তাকে উদ্দেশ করে বলেন—ঘুড়ি ওড়াচ্ছো? তা' সুতো কই?

যামিনীমোহন একটু রহস্যযুক্ত হাসি হেসে বলেন—আমার কাছে সুতোর কারবার নেই। সুতোবিহীন ঘুড়ি, হাত থেকে ছেড়ে দিই, যেদিকে ইচ্ছে ওড়ে।

সন্তোষিণী মুখ টিপে হেসে উত্তর দেন—তাই তোমার সংসারের অবস্থাও এমন উড়ু উড়ু। কিন্তু আর কতোদিন এ রকম ঘুড়ি ওড়ানো চলবে? ওদিকে যে পেন্‌সনের সময় হয়ে এলো?

—আসুক না—যামিনীমোহন বেপরোয়াভাবে বলেন—দুর্দ্দিন আসবে ভেবে ফাগুনের দিনে দক্ষিণের জানলা এঁটে থাকবো নাকি?

° ° ° °

ইত্যবসরে নোটগুলো হস্তগত হওয়ায় ছেলেদের কোলাহল কিছু

স্তিমিত হয়ে আসে···নিজেরা দেখাদেখি করতে থাকে সন্তপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যগুলি।

আরামকেদারাটায় এইবার এসে বসেন যামিনীমোহন।

গোবিন্দ 'টুক্' করে ঘরে ঢুকে একটা সিগারেটের টিন এনে চেয়ারের হাতায় রাখে।

রাগতঃভাবে এসে দাঁড়ায় পুরণো চাকর হরি!

বলে—আপনাদের কাণ্ডখানা কী বাবু? লোট্ দু'খানা বারান্দা থেকে উড়ে ফুটপাথে গে' পড়লো! আমি যাই পান কিনতে গিয়ে উই মোড়ে মাথা থেকে দেখতে পেলাম! তাই রক্ষে! এই নিন্।

একখানা এক টাকার ও একখানা দু' টাকার নোট সিগারেটের টিনের ওপর রাখে হরি।

যামিনীমোহন হেসে বলেন—তুই পেয়েছিস তুই নে!

—ক্ষ্যামা গ্যান বাবু, এমন ভূতুড়ে কাণ্ড আমার বরদাস্ত হয় না। এ বাড়ীতে টাকা যেন খোলামকুচি!···গোবিন্দদা' যাও নীচে যাও, তোমার খেলার কেলাবের ছেলেরা এসে হাঁক পাড়ছে···

গোবিন্দ সচকিত হয়—এই মরেছে। এসেছে ডাকতে?···টাকা তুলে নাও হরিদা', ও আর মামা ফেরৎ নিয়েছে! দোহাত্তা এই রকম বেপরোয়া বাজে খরচ করে করেই উচ্ছন্ন যাবে মামা!

গোবিন্দ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে।

শিশুবাহিনীও তার পিছন পিছন অদৃশ্য হয়।

থাকেন কর্ত্তা গিন্নী! যামিনীমোহন সব্যঙ্গতাচ্ছিল্যে বলেন—বন্ধুগুলি বেশ জুটেছে গোবিন্দবাবুর! রতন চেনে!

সন্তোষিণী ওকালতির ভঙ্গীতে বলেন—তা' বলে কিন্তু ওরা শুধু

খেলাধূলো আড্ডা নিয়ে থাকে না, অনেকের অনেক উপকার করে। সেই সব করতে দলই করেছে একটা।

—বটে তাই নাকি? উপকারটা কি ধরণের?…

—এই তো—কোথায় কোন গরীব দুঃখীর ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে, সেবা যত্ন হচ্ছে না, ছুটছে সেবা করতে; ঘরে মড়া পড়ে আছে—উঠছে না, যাচ্ছে কোমরে গামছা বেঁধে—

কথার মাঝখানে হেসে ওঠেন যামিনীমোহন। শ্লেষের হাসি।…

এগুলো যেন বড্ড জোলো লাগে তাঁর কাছে। হেসে বলেন—ভালো ভালো, মরবার সময় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো। কোমরে গামছা বাঁধবার লোকের অভাব হবে না।

—কি কথার ছিরি!

ভ্রূভঙ্গী করেন সন্তোষিণী।

কাচের গ্লাসে এক গ্লাস ওভাল্‌টিন নিয়ে প্রবেশ করেন বড়োছেলের বৌ।

—বাবা, আপনার ওভাল্‌টিন খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে—

যামিনীমোহন হাত বাড়িয়ে গেলাস নিয়ে বলেন—উঁহু, পার হবার জো কি, মায়ের শাসন বড়ো কড়া।

বড়ো বৌ এই স্নেহের ভাষাটি স্মিতহাস্যে পরিপাক করে নিয়ে বলেন—মা মেজ বৌ আপনাকে খুঁজছিলো।

—কেন? আমাকে কেন?—সন্তোষিণী প্রশ্ন করেন।

—ওই যে বাবাকে মাছের কচুরি ভেজে খাওয়াবার সখ হয়েছে নাকি, আপনি দেখিয়ে দেবেন বলেছিলেন—

—ওমা তাই তো—যাই'। পারে না কিছু সখটুকু ষোলো আনা।

তা' এসব হচ্ছে ফাগুনের দিনে'র ছবি।

দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে মলয় বাতাস তো আসবেই।

কিন্তু—

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে উঁকি দিয়েছে বর্ষা।

মলয়-বাতাস নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সংসারের সর্ব্বত্র বইছে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ভারী ভারী পূবে হাওয়া।

অবসর নিয়েছেন যামিনীমোহন।

এখন আর—নিখুঁত ইস্ত্রী করা দামী স্যুট পরিহিত যামিনীমোহনকে নিজের মোটর চড়ে আসতে যেতে দেখা যায় না। খরচ বাঁচাবার প্রথম পর্য্যায়ের প্রথম বলি হয়েছে গাড়ীখানা।

ছেলের বৌরা গাড়ী বিক্রীর প্রস্তাবে প্রায় ধরাশায়িনী হয়েছিলেন, গৃহিণী ছিছিকার করেছিলেন, সে সব গ্রাহ্য করেন নি যামিনীমোহন। কে জানে নিজের তাঁর কোনো অসুবিধে বোধ আছে কি না। কে জানে স্বচ্ছন্দে, না বাড়ীর লোককে সৎশিক্ষা দিতেই আজ হাঁটার উপকারিতা কীর্ত্তন করেন।

ঢিলে-ঢালা পোষাক-পরা অবসরপ্রাপ্ত যামিনীমোহনকে হঠাৎ যেন অনেকটা বেশী বুড়ো লাগে।

মনে হয় একটু বেশী কড়া, একটু বেশী রুক্ষ।

যেন সমস্ত সংসার থেকে অনেকটা তফাতে সরে গিয়ে দূর থেকে সংসারটাকে দেখছেন যামিনীমোহন, কেমন একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে।

হৃদয়ের যোগ সূত্রটা কি ইচ্ছে করেই নিজের খেয়ালে ছিঁড়ে ফেলছেন যামিনীমোহন?

দুই

এমনি দিনে একদিন, সন্তোষিণীর বিধবা বড় মেয়ে মুরলা আরক্ত মুখে মা'র কাছে এসে অভিযোগ করে—মা, সামান্য বাইশটা টাকা চাঁদার অভাবে খোকার আমার ক্লাবে নাম কাটা যেতে বসেছে—তিন মাস বাছা হাত খরচ পায় নি। মান খুইয়ে বলতে গেলাম বাবাকে, আর বাবা কিনা সাফ জবাব দিয়ে বসলেন—দিতে পারবো না!

সন্তোষিণী মনে মনে প্রমাদ গুণলেও মুখে হালকা ভাবে বলেন—ও মা সে কি, কেন?

মুরলা দুই হাত উল্টে বলে—কেন আবার কি! এই রকম ব্যাভারই তো পাচ্ছি আজকাল। এ রকম—হাতে না মেরে ভাতে মারার বদলে পষ্ট বললেই হয় 'বিদেয় হও'! খোকা যখন এসে বলছে—'নাম কাটা যাওয়া মানেই মাথা কাটা যাওয়া! ইচ্ছে হচ্ছে গলায় ক্ষুর বসাই—' তখন, মা হয়ে যে আমি কোন প্রাণে—

কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে মুরলার।

বিব্রত সন্তোষিণী ব্যস্ত ভাবে বলতে বলতে যান—রোসো তো দেখি গে আমি, কর্ত্তার ভীমরথী ধরলো না কি।

কর্ত্তার কাছে গিয়ে চটে মটে বলেন—তোমার দিনকে দিন কী আক্কেল হচ্ছে?

যামিনীমোহন নিজস্ব আরাম কেদারাখানিতে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কাগজ থেকে মুখ তুলে বলেন—অ্যাঁ কি বলছো?

—বলছি—আমার মুণ্ডু! বলছি সুব্রত নাকি ওর ক্লাবের চাঁদার দরুণ বাইশটা টাকার অভাবে লজ্জায় পড়েছে, আর তুমি জবাব দিয়ে দিয়েছো—'দিতে পারবো না?'

যামিনীমোহন গম্ভীর হাস্যে বলেন—তা বলেছি বটে।

—ছি ছি! একটু লজ্জা হলো না?

লজ্জা? যামিনীমোহন সন্তোষিণীর মুখের দিকে চোখ তুলে ঈষৎ হাস্যে বলেন—কই আর হলো? বেশ তো স্বচ্ছন্দেই বলে ফেললাম। পকেটে অর্থ না থাকলে, লজ্জা থাকাটাই অর্থহীন বুঝলে গিন্নী।

সন্তোষিণী কিছুটা নরম হয়ে বলেন—কিন্তু মুরলা কি ভাববে বলো তো?

—শুধু মুরলা? যামিনীমোহন একটু উঁচুদরের হাসি হাসেন—মুরলা ভাববে, সুব্রত ভাববে, ছেলেরা ভাববে তুমি ভাববে, বন্ধু প্রতিবেশী আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে সবাই কতো কি ভাবতে সুরু করবে! এখুনি হয়েছে কি!

সন্তোষিণী একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলেন—আচ্ছা এবারটির মতো না হয় দিয়ে দাও। ছেলেবেলা থেকে যখন যা চেয়েছে তার চাইতে বেশী দিয়ে এসেছো, আজ হঠাৎ এই সামান্য কটা টাকার জন্যে—

যামিনীমোহন গম্ভীর ভাবে বলেন — উপায় নেই গিন্নী উপায় নেই। বাইশটা টাকা এখন আর "সামান্য" নয়। টাকা যখন ছিলো, তখন কোনো কিছুতে রাশ টানি নি, আজ যদি সংসারের এই সব বাজে খরচের ওপর কাঁচি না চালাই, এরপর যে ভাতে টান পডবে!

সন্তোষিণী বিরক্তভাবে বলেন—তোমাব কথাবার্ত্তা যা হয়েছে

আজকাল, শুনলে গা জ্বালা করে। ভাতেই বা টান পড়বে কেন আমার ছেলেরা কি মুখ্য না—অক্ষম ?

—ওঃ ছেলেরা ?···হ্যাঁ তা' বটে ! বলে একটু শ্লেষের হাসি হাসেন যামিনীমোহন।···অনেক কিছু ব্যক্ত হয় এই হাসিটুকুর মধ্যে।

সত্যি তিন ছেলে সন্তোষিণীর, কেউই মুখ্যও নয় অক্ষমও নয়।

কর্ত্তার ওপর অভিমান করে বড়োছেলে সুবিমলের কাছে গিয়ে হাত পাতেন সন্তোষিণী।

—ভীমরথী ধরেছে ওঁর। বাইশটা টাকা তুই আমাকে দে দিকিন সুবিমল! সুব্রত বুঝি ক্লাবের চাঁদা দিতে পায়নি, তোর বড়দি কাঁদছে।

সুবিমল চমকে ওঠে—অ্যাঁ! উনিশ বছরের ছেলে ক্লাবের চাঁদা বাইশ টাকা! টাকা কি খোলামকুচি? আমার অতো বাজে নষ্ট করবার মতো টাকা নেই মা! তোমার চাঁদা-চাওয়া নাতির আবদার মেটাবার এতোই সখ হয়ে থাকে, পরিমলকে বলে দেখো—

মেজছেলে পরিমলের হয়ে উত্তর দেন মেজবৌ।

বলেন—আপনাদের সবতা'তেই বাড়াবাড়ি মা। নাতি হলেও অতো আদর দেওয়া ঠিক নয়। তা'ছাড়া—এমাসে ওব লাইফ্ ইনসিওরের প্রিমিয়াম দিতে হবে, পারবেন কোথা থেকে? বাবার মতন 'উপ্‌রি আয়ের' উপায় তো এসব চাকরীতে নেই মা ?

অবিবাহিত পুত্র নির্ম্মল বলে—আমাকে বাবার মত বেহিসেবি পাওনি মা। খরচ করবো—বুঝে, বিবেচনা করে। সুব্রতের যে এসব লাট সাহেবী এখন কমানোই দরকার, সেটা বুঝতে দাও বড়দিকে।

যামিনীমোহনের পকেটের প্রাচুর্য্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা প্রতিকথায় মাকে 'বুঝে চলবার' উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেরা ?

নিজেরা কে 'কতোটুকু বোঝে. তার প্রমাণ পাওয়া যায় সামান্য সামান্য ঘটনায়, ছোট ছোট ইসারায় ইঙ্গিতে।

একদিন সকালে — তুফান ওঠে চায়ের পেয়ালায়।

চিরাচরিত প্রথায় তিন ছেলে ও ছোট মেয়েকে নিয়ে কর্ত্তা বসেছেন চায়ের টেবিলে। পরিবেশনকারিণী মেজ বৌ।

বড়বৌ এ সময়ে থাকেন — রান্নাঘরের তদারকে। ভাঁড়ার দেওয়া আর কুটনো কোটার ভার তাঁর।

পরিমল চায়ে একটা চুমুক দিয়েই পেয়ালাটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে বলে ওঠে — অখাদ্য! চা যা হচ্ছে আজকাল, গলা দিয়ে নামানো. অসম্ভব। এরকম চা খাওয়ার কোনো মানে আছে?

নির্ম্মল মুচকি হেসে বলে ··· মন্দ কি? চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরেতার জল খাওয়ার কাজ হয়।

মেজবৌ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন — দামেও বোধ হয় চিরেতার সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ নেই। এই কোয়ালিটির চা, যদি — এর চাইতে টেষ্টফুল হওয়া সম্ভব হয়, যে পারবে সে যেন চা তৈরির ভার নেয় কাল থেকে। আমার দ্বারা হবেনা।

যামিনীমোহন বধূকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলেন — কই মেজ বৌমা, চা তো খেতে খারাপ হয় নি, এই তো দিব্যি খেয়ে ফেললাম আমি। ··· নাঃ তোমাদের আজকাল বড্ডো ত্রুটিধরা স্বভাব হচ্ছে!

নির্ম্মল নিজস্ব তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে বলে — হতে পারে! যাক — এবার থেকে বরং আপনি একাই খাবেন। দিব্যি খাবেন।

ছোটমেয়ে গীতশ্রীও ছোটদার মতো তাচ্ছিল্যের সুরে বলে — সত্যি অকারণ এই একটা খরচের ব্যাপার রেখেই বা লাভ কি? তুলিয়ে

দিলেই হয় বাড়ী থেকে? অনেক কিছুই তো তুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আজকাল!

যামিনীমোহন ছেলেদের কথা কষ্টে পরিপাক করছিলেন, মেয়ের কথাটা আর পারেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বলেন — খেতেও পারেন না কেউ অথচ পড়তেও পায় না। ফুরোনোর কামাই তো দেখিনা কিছু। এবেলা ওবেলা টিন টিন চা ডানা মেলে উড়েও তো যাচ্ছে দিব্যি।

সুবিমল এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো এবারে গম্ভীরভাবে বলে — আচ্ছা ভবিষ্যতে যাতে আর না ওড়ে সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া যাবে।

পরে শোনা যায় সুবিমল ভাত না খেয়ে অফিস গিয়েছে।

ওদিকে ভাঁড়ার ঘরের মেঝেয় বঁটি পেতে বসে দ্রুত অঙ্গুলি চালনায় লাউ কুটতে কুটতে বড়বৌ বোধকরি শ্বাশুড়ীর সাবধান বাণীর উত্তরে ঝঙ্কার দেন — হাত পা আমার খুব সাবধান আছে মা, মেজাজের ঠিক রাখাই শক্ত হচ্ছে। যতো রাজ্যের পচা আলু, পোকা খাওয়া বেগুন, শুকনো আনাজ খুঁজে খুঁজে কিনে আনার প্রবৃত্তি যে কি করে হয় মানুষের বোঝা অসাধ্য! বাজারে যে এরকম জিনিস পাওয়া যায়, তাই জানতাম না। ওদিকে মাছের বহর দেখুন গে, একবেলা ছৈ আর দু'বেলা খেতে হবে না কারুর! কাল থেকে সবাইয়ের খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনা বরং আপনিই করবেন।

— আমি! সন্তোষিণী অপ্রতিভ ভাবে বলেন — তা' হলেই হয়েছে। আমার তো কম জিনিস দেখলেই বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায়। ... কি জ্বালা যে হলো! কর্ত্তার দেখছি যাট বছর বয়েস না হতেই বাহাত্তুরে ধরেছে। নইলে কখনো যা করেন নি, তাই করছেন! লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে যাচ্ছেন বাজারে!

বড়বৌ মুচকি হেসে বলেন — শুধু তাই? ওই দেখুন গে না, কলতলায় মোক্ষদার কি শাস্তি!

তা শাস্তিই বটে। এ বাড়ীর ঝি চাকররা চিরদিন বেপরোয়া স্বরাজ পেয়ে এসেছে এখন যদি তুচ্ছ একখানা কাপড় কাচা সাবানেরও হিসেব চাওয়া হয়, বরদাস্ত করা সহজ?

তা মুখনাড়া দিতে সেও ছাড়ে না।

একরাশ কুচো জামা পাজামা গেঞ্জি ইত্যাদি জড়ো করে এনে সে একেবারে বেপরোয়া নামিয়ে দেয় যামিনীমোহনের পায়ের কাছে। — এই দেখুন বাবু বিবেচনা করুন, সাবান আমি খাই না মাখি। দেখছেন তো — পিত্যেক দিন ক' গাড়ী কাপড় জামায় সাবান লাগাতে হয়। পরিষ্কার না হলেও তো বৌদিদের কাছে মুখনাড়া খেতে হবে। অন্য ঝি হলে দুখানা সাবান খরচ করতো।

রায়বাহাদুর চশমার কাঁচটা একবার মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে সরে যান।

ঝি মোক্ষদা তখনো আপন মনে চালাতে থাকে — পুরুষ বেটা-ছেলেকে আপিস কাছারীতেই মানায়। বাড়ী বসে থাকলেই নজর নীচু হয়ে যায়। পেনসিল নেবার আগে তো বাবু এমন ছিলো না। ত্যাখন ত্যাখন এই সাবান ঘরে নে গিয়ে এর ওর কাছে বেচে কতো পয়সা করেছি! গাঁটের কড়ি খরচা করে একটা পান কখনো খাইনি। আপনার ঘরের দরকার মুনিব বাড়ী থেকে ইচ্ছেমতন জিনিশ নিয়ে গেছি, তাকিয়ে দেখেনি কেউ। আর এখন? সেদিনকে একটা দেশলাই বুঝি ভুলে আঁচলে বেঁধে বাড়ী যাচ্ছিনু। বড়ো বৌদিদি যাচ্ছেতাই করলো! বাবাঃ! ওইযে মানুষটি, হাত দে' জল গলেনা।...বলে কিনা —"বাবুর আমলে অনেক ঠকিয়ে খেয়েছে তোমরা, আমাদের

আমলে ওসব চলবে নি”—শ্বশুর বুড়ো জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতে আমাদের আমলে বলতে মুখে বাধলোনি !···নাঃ এবাড়ীতে আর বেশীদিন টিঁকতে হবেনি।

এবাড়ীতে যে টেকা দায় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো কদিন পরেই। একাদিক্রমে তেইশ বছর কাজ করছে হরি এবাড়ীতে, সেই হরিকেই একদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজস্ব পোঁটলা পুটলি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেলো।

কার কারসাজিতে কী ঘটছে সংসারে সে সম্বন্ধে সবচেয়ে অনভিজ্ঞ শ্রীমান গোবিন্দ। ও আপন খেয়ালে খোসমেজাজে পার্ক থেকে ফিরছিলো—আদরিণী 'লিলি'কে বেড়িয়ে নিয়ে।

'লিলি' নামধারিণী বিদেশিনী মহিলাটি এক সময় যামিনীমোহনেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন, কোন ফাঁকে কে জানে আপাতত তার মালিকানা সত্ত্বটা গোবিন্দর উপরই বর্ত্তেছে।

ছুটিবেলা তাকে বেড়িয়ে আনা নাওয়ানো খাওয়ানো সবই গোবিন্দর ডিউটির অন্তর্গত। তার গলায় বাঁধা প্রেম শৃঙ্খলটি ধরে টানতে টানতে এবং গুণগুণ করে বেসুরো গান গাইতে গাইতে বাড়ী ঢুকতে যাচ্ছিল গোবিন্দ, থমকে দাঁড়ালো হরিকে দেখে।

—একি হরিদা কি হলো ? যাচ্ছো কোথা ?

হরি উত্তরের পরিবর্ত্তে—'গোবিন্দদা', বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে।

গোবিন্দ অবাক।

—আরে কি হলো তাই বলোনা ? কেঁদেই চল্লে যে বুড়ো মিনসে ! বলি—মামা গালমন্দ করেছে ? কী মুস্কিল ! এ বুড়ো ঢেঁকির সক্কাল

বেলা মুনের নৌকো ডুবে গেলো কেন? পোঁটলা পুটলি নিয়ে যাচ্ছোই বা কোন খানে?

এতোক্ষণে হরি কান্না সামলে জবাব দেয়—আজ তেইশ বছর পরে হরির এবাড়ী থেকে অন্ন উঠলো গোবিন্দদা!

তার মানে?

গোবিন্দ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে।

হরির "অন্ন ওঠা" কথাটা এমনি অবিশ্বাস্য যে বুঝে উঠতে পারেনা।

হরি গলাঝেড়ে বলে—মানে টানে জানিনে গোবিন্দদা, শুনতে পাচ্ছি আমি নাকি বড়দাদাবাবুর পকেট মেরেছি! হা ভগবান! এবাড়ীতে যখন ঢুকেছি বড়দা'বাবু তখন ইস্কুলের ছেলে, টিফিন নিয়ে গিয়ে হাতে করে খাইয়ে এসেছি আমি।...বাবু তখনও 'রয়বাহাদুর' হয়নি, সেজদাদাবাবু সেই বছর ইস্কুলে ভর্তি হলো। তুমি আর ছোটদা' বাবু এতোটুকু টুকু খোকা! তোমার মা—বাবুর মামাতো বোন না কে হতো যেন—মরণকালে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেলো—এবাড়ীর গিন্নী মার কাছে—সব আমার চোখের সামনে—

অসহিষ্ণু গোবিন্দ বলে ওঠে—আরে দূর বাবা, ওসব পুরণো গপ্পো কে এখন শুনতে চাইছে তোমার কাছে? 'পকেট মারা' ব্যাপারটা কী তাই বলোনা? নাঃ আবার কাঁদতে বসলো কচি খোকার মতো।... তবে মরো কেঁদে—

হরি কান্না থামিয়ে কাতর গলায় বলে—শুনতে পাচ্ছি 'পেরায়দিন' নাকি বড়দাদাবাবুর পকেটের পয়সায় ঘাটতি হয়, তাই বড়ো বৌদিদি তক্কে তক্কে ছিলো, আজ 'পষ্ট' দেখেছে আমি পকেট হাতড়াচ্ছি—

গোবিন্দ বলে—হুঁঃ! বড়োবৌদির আজকাল দিব্যদিষ্টি খুলে গেছে দেখছি! তা' মামা তোমায় কি বল্লে?

হরি চোখ মুছে বলে—বাবু বললেন—"হরি এবাড়ীতে কারুর আর বেশীদিন মান সম্ভ্রম বজায় রেখে বাস করা চলবেনা, তুই যা। এরপর কোনদিন মার খেয়ে বিদেয় হতে হবে, এই বেলাই বিদেয় হ'।

হরি একবার দোতলার দিকে তাকায়।

দোতলার বারান্দায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন যামিনীমোহন, 'হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়া' আসামীর মতো, সরে গেলেন!

যামিনীমোহনের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্তোষিণী। তাঁর চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত।

তিনি বিষাদ গম্ভীর স্বরে বলছেন—কিন্তু ন্যায়বিচার করতে গেলে যে বড়ো বৌমাকে মিথ্যেবাদী বলতে হবে।

যামিনীমোহন উত্তেজিতভাবে বলেন—কিন্তু তেইশ বছরের পুরাণো হরি, এই মিথ্যে অপবাদ নিয়ে রায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে আর যামিনীমোহন রায় তাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখবে? একটি প্রতিবাদ করবে না যে সত্যি মিথ্যেবাদী—

সন্তোষিণী মৃদুস্বরে বলেন—ওগো চুপ করো তোমার পায়ে পড়ি, একথা ওদের কানে গেলে একখুনি আগুন জ্বলে উঠবে বাড়ীতে।

যামিনীমোহন একটা অদ্ভুত হাসি হাসেন—ওঃ আগুন! কিন্তু গিন্নী যে আগুন তলে তলে অবিরত ধোঁয়াচ্ছে তা'কে তুমি আঁচল চাপা দিয়ে ক'দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? একদিন না একদিন ওদের নিজেদের দুর্ব্বুদ্ধির বাতাসে সে আগুনকে জ্বালিয়ে তুলবেই তুলবে ওরা।

নীচের তলায় তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে গোবিন্দর গলা—বল্লেই

হলো হরিদা চোর! এ কি মামদোবাজী নাকি? হরিদা যদি চোর হয়, তা'হলে— এ বাড়ীতে এক ধার থেকে সবাই চোর!

মুরলা তা'কে ধমকে ওঠে—তুই থাম দিকি, তোকে কে লম্বা লম্বা কথা কইতে বলেছে?

গোবিন্দ বলে—লম্বা বেঁটে জানিনা বড়দি। জিভটা দিয়েছে ভগবান ন্যায্য কথা কইবার জন্যে, কয়ে যাবো বাস্! কারুর ভালো লাগুক চাই না লাগুক। চন্দ্র সুয্যি উল্টে যেতে পারে হরিদা চুরি করতে পারেনা!

মুরলা শাসনের ভঙ্গীতে বলে—তবে শুধু শুধু হরির নামে বদনাম দিয়ে বড়ো বৌয়ের লাভ?

গোবিন্দ বিজেতার মতো হাসে—হুঁ হুঁ বাবা, লাভ লোকসান বোঝোনা? হরিদা হলো গে মামার একার খাস চাকর, ওনাদের তো কোন কাজে লাগেনা? ওর ভাত কাপড়ের খরচাটা বড়ো বৌদির গায়ে ছুঁচের মতন বিঁধছে। বড়োগিন্নীর যে ওয়ান পাইস্ ফাদার মাদার, দেখতে পাওনা?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নির্ম্মল থমকে দাঁড়ায় বলে—গোবিন্দ, বড্ডো দেখছি বাড় বেড়েছে তোর আজকাল ফের যদি এরকম কথা শুনি, একটি ঘুঁসিতে তোর ওই সাধের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবো বলে রাখছি।

গোবিন্দ আর নির্ম্মল প্রায় সমান বয়সী, ছেলে বেলা থেকে উভয় পক্ষেই 'তুই তোকারি'টা রপ্ত।

নির্ম্মলের এই বীরজনোচিত উক্তিতে ও একটু কাঁধ ঝাড়া দিয়ে হেসে চোখ কুঁচকে বলে—মাইরী আর কি, এই সাতাশ বছরের সাধনার ভুঁড়িটি তোর ওই সুঁটকো ঘুঁসিতে ফাঁসলো আর কি!··· হক্ কথা আমি কইবোই বাবা! মোসাহেবী করা গোবিন্দর কুষ্ঠিতে লেখেনা।

সন্দেহ দৃষ্টিতে নিজের হাতের মাসলের দিকে তাকাতে তাকাতে গোবিন্দ সামনের একটা উঁচু তাক থেকে একটা ছোট কাঁচের বাটি পেড়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলে—দাও দিকিন, একটু তেল দাও দিকিন। হরিদা তো সটকান দিলো—বুড়োরই দুর্গতি!

তেলের পলা হাতে করে একটি নতমুখী বৌ এসে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে ঢেলে দেয় তেলটা।···

গোবিন্দ ঈষৎ নীচু গলায় সাশ্চর্য্যে বলে—কি ব্যাপার, তোমার আবার কি হলো? নাঃ। এ বাড়ীতে আজ সবাই "কান্না ষষ্ঠির ব্রত" নিয়েছে নাকি?

বলা বাহুল্য বৌটি গোবিন্দরই।

সে ভীত মৃদু গলায় বলে—তুমি ওঁদের সব কথায় থাকতে যাও কেন বলো তো?

গোবিন্দ চমকিত বিস্ময়ে বলে—'ওঁদের'? ওঁদের মানে? কাদের?

—এই, বড়দি মেজদিদের।

—বটে? ওঁদের কথায় থাকতে যাবো না! কেন বলো দিকি? পরের মেয়েরা উড়ে এসে জুড়ে বসে হঠাৎ এতো তালেবর হয়ে উঠলো কি করে যে তাঁদের কথায় থাকা চলবে না? ওঃ তোমারও গায়ে লাগছে বুঝি? এক গোয়ালের গরু তো সব গোবিন্দ কাউকে ভয় টয় করেনা বাবা। কান্না ফান্না রাখো। সব সহ্য হয় ওইটি সহ্য হয় না।

তেলের বাটি নিয়ে দুম দুম্ করে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

ওপরে গিয়ে যামিনীমোহনের কাছে দাঁড়িয়ে বলে—নাও মামা,

জামাটা খোলো দিকিন, মামী যাও যাও নীচে যাও। দেখোগে ওদিকে তোমার বৌ বেটারা রসাতল সুরু করেছে।...কই মামা—

বলে নিজেই যামিনীমোহনের জামাটা ধরে টানে।

যামিনীমোহন ঈষৎ বিরক্ত মিশ্রিত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান। অর্থাৎ এর মানে কি?...তারপর বোধকরি বুঝতে পেরে স্থিরস্বরে বলেন...থাক!

গোবিন্দ স্বচ্ছন্দে বলে—চোখ পাকিয়ে গোবিন্দকে তাড়াতে পারবেনা মামা। বোসো দিকি শান্ত হয়ে। বলি—হরিদাকে তো এককথায় ডিস্‌মিস্ করলে, বিশ বছরের অভ্যাসটাকে একদিনে ডিস্‌মিস্ করলে সইবে?

যামিনীমোহনের রুক্ষ দৃষ্টি ধীরে ধীরে কেমন যেন কোমল হয়ে আসে।

গোবিন্দকে কি ভালো করে কোনদিন তাকিয়ে দেখেন নি যামিনীমোহন?

ওর এই নতুন পরিচয় পেয়ে কি আবাক হচ্ছেন?

যামিনীমোহনের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন গোবিন্দর অনুভূতির রাজ্যে ঠাঁই পায়?...উদোমাদা বুদ্ধিহীন গোবিন্দ!

নীচের তলায় তখন তুমুল বৈঠক বসেছে।...মুরলা পরিমল বড়ো বৌ।

মেজ বৌ শাড়ীর আঁচলটা পিঠে ফেলে ঠিকরে এসে দাঁড়াম!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন—ওপর ওলাদের প্রশ্রয় আছে অবশ্যই! তা' নইলে—এতো সাহস আসে কোথা থেকে?

বড়বৌ বলেন—এদিকে 'খরচ খরচ' করে সংসারের সব কিছুর ওপর রাশটানা হচ্ছে, অথচ কতো বাজেখরচ চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে তার

হুঁস্ নেই। মা বাপ মরা ভাগ্নেকে ছোট বেলায় মানুষ অমন করেই থাকে লোকে। তাই বলে চিরদিন যে সেই ভাগ্নে বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে, সে শুধু এই সংসারেই দেখছি। সখ করে আবার তার এক বিয়ে দেওয়া হয়েছে! শেষ পর্য্যন্ত পুষবে কে বাবা? তাই যদি মানুষ হ'তো!···হয়ে বসে আছেন তো একটা গোঁয়ার গোবিন্দ চাষা।

পরিমল বলে—সত্যি গোবিন্দর ওই বিয়ে দেওয়াটা যে কী বিশ্রী একটা কাজ হয়েছে মা'র। অমন মেয়েটা—হয়েছে যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা!

কথাটা খুব মিথ্যাও নয়।

গৌরী মেয়েটি এসংসারে বানরের গলায় মুক্তার মালার দৃষ্টান্ত হয়েই বিরাজ করছে।

প্রকৃত ঘটনা এই—

মেয়েটি সন্তোষিণীর বাল্যসখী 'গঙ্গাজলে'র মেয়ে।

'গঙ্গাজলে'র অবস্থা বরাবরই খারাপ সন্তোষিণীও বরাবরই লুকিয়ে এবং দেখিয়ে বহুবিধ সাহায্য করে এসেছেন তাঁকে, যামিনীমোহনের আপত্তি ছিলোনা কখনো।

কিন্তু বছর কয়েক আগে স্নেহশীলা সন্তোষিণী হঠাৎ যেদিন বাল্যসখীর উপর অগাধ স্নেহের বশে তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যাটিকে 'ঘরে আনবার' প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন সেদিন বাধলো বিপদ।

এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা কেবলমাত্র যামিনীমোহনের আর্থিক আনুকূল্যে হবার উপায় নেই, 'আনবার' জন্যে বাহক পাঠাতে হয় কনিষ্ঠপুত্র নির্ম্মলকে। নির্ম্মলের মতামত নেবার আবশ্যকতা অনুভব করেননি অল্পবুদ্ধি সন্তোষিণী। বিচক্ষণ যামিনীমোহন বললেন—কাজটা ভালো

করোনি গিন্নী নির্ম্মল রাজী হবে না। এবং একটি ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিতে বলো, খরচ আমি দেবো।

সন্তোষিণী কাতর ভাবে বলেন—কিন্তু আমি যে নিজের ঘরে আনবো বলে বাক্যদত্ত হয়ে বসে আছি।

যামিনীমোহন মৃদুহেসে বলেন—সেইটাই বড়ো ভুল হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ভাগের সব বানানগুলো মুখস্থ রাখতে হয় বুঝলে? আগে 'ঐক্য', তবে 'বাক্য', ভুলে গেছো? যাক দেখো চেষ্টা করে, যদি—মায়ে ব্যাটায়, ঐক্যসাধন করতে পারো।

কিন্তু—'ব্যাটা' অর্থাৎ শ্রীমান নির্ম্মল প্রস্তাব শুনে মাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিলে।

—কি হয়েছে? তোমার সেই 'গঙ্গাজলের' মেয়েকে বিয়ে করতে হবে? হঠাৎ বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেলো না কি তোমার?

সন্তোষিণী বিরক্ত হয়ে বলেন—কি এমন অসঙ্গত কথা বলেছি বাছা, 'গঙ্গাজল' না হয় গরীব, কিন্তু মেয়েটি রূপে গুণে লক্ষ্মী।

—চমৎকার। তাহলে আর চিন্তা কি মা? লক্ষ্মীর বাহন হ'তে অনেক প্যাঁচা জুটবে, আমায় নিয়ে টানাটানি কেন?

সন্তোষিণী আবদারের ভঙ্গীতে বলেন—তা' বললে শুনছি না। আমি কথা দিয়েছি।

নির্ম্মল অবহেলার হাসিতে বিদ্রূপের ঝাঁজ মিশিয়ে বলে—'কথা' দেওয়া জিনিশটা কি এতোই সস্তা মা? নিজের ওজন না বুঝে দিয়ে ফেললেই হলো?

দালানের ওপাশে বসে তেল মাখছিলো গোবিন্দ। সে নির্ম্মলের শেষের কথাটায় হঠাৎ চমকে উঠে বলে—কি বললি রে নির্ম্মল? তুই নিজে তো খুব ওজন রেখে কথা বলছিস?

নির্ম্মল অবজ্ঞায় ওর কথার উত্তর দেয়না, মাকে উদ্দেশ করে বলে—ওসব সখ তুলে রেখে দাও গে মা। মায়েরা ছেলেবেলায় কবে কার সঙ্গে গোবরজল, গঙ্গাজল, ডাবেরজল, মিশ্রীর জল, পাতিয়ে রাখবে তাঁদের কাছে যা ইচ্ছে 'কথা' দিয়ে বসবে, আর সুবোধ সুশীল ছেলেরা—মাতৃসত্য পালন করতে টোপর মাথায় দিয়ে ছুটবে, সে সব যুগ কেটে গেছে। কথা দেবার সময় বিবেচনা করা উচিৎ ছিলো — সে কথা রাখবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না!

হঠাৎ গোবিন্দ তেড়ে উঠে এসে বলে—আলবাৎ আছে। মামী যা হুকুম করবেন মানতে হবে, বাস্।

নির্ম্মল ব্যঙ্গ মিশ্রিত তীব্র একটু হাসি হেসে—'বটে'? বলে চলে যায়।

সন্তোষিণীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।

হাঁ তপ্তই তো!

অপমানের অশ্রু তপ্ত বৈ কি।

মিনিট খানেক সেইদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে গোবিন্দ হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলে ওঠে—মামী, তোমার ওই 'গোবর জল' না 'গঙ্গাজল' কে যে কী 'গোত্তর' ওরা?

সন্তোষিণী সচমকে বলেন—কেন? তা' নিয়ে তোর দরকার?

—বলি আমার সঙ্গে আটকাবে? না যদি আটকায়,— কুছপরোয়া নেই! বায়না দাও সানাইয়ের।

সন্তোষিণী দুঃখের হাসি হেসে বলেন—তোকে ওরা মেয়ে দেবে কেন?

—দেবে না — মানে?···রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের ভাগ্নেকে মেয়ে দেবে না, এতো চাল্ তোমার গঙ্গাজলের? এ দিকে তো শুনি ভাঁড়ে মা ভবানী দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না।

সন্তোষিণী এই ক্ষ্যাপা পাগলের দিকে একটা সন্দেহ দৃষ্টি ফেলে বলেন—তাদের না হয় হাঁড়ি চড়ে না, তুই বা বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবি কি ?

গোবিন্দ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে—আমি কি খাওয়াবো মানে ? আমার হাঁড়িতে এমন আকাল লাগলো কবে ?

সন্তোষিণী দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে বলেন—আমার হাঁড়ি ভরসা করে তুই বিয়ে করবি কেনরে গোবিন্দ ? আমরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবো ? এই তো—তোর মামার ব্লাড প্রেসার, ও সব রোগে ভরসা কি ?

গোবিন্দ বিরক্তভাবে বলে — দেখো মামী, খামোকা ভরদুপুরে মামার অকল্যাণ কোরোনা বলে দিচ্ছি।—সোজা' কথা বলছি — নির্ম্মল হতভাগার খোঁতামুখ ভোঁতা করে বিয়ের জোগাড় লাগাও তুমি। লাগাও বাদ্যি বাজনা। কসে ঘটা পটা করো। ফ্যালফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখুন বাবু, আর মনে মনে পস্তান।

তা' সন্তোষিণীও সেদিন এই ক্ষ্যাপা ছেলেটার কথায় নেহাৎ ক্ষ্যাপার মতো কাজই করে বসেছিলেন।

তখনো যামিনীমোহনের উজ্জ্বল কর্ম্মজীবন।

পেনসনের ভিক্ষা মুষ্ঠিমাত্রই একমাত্র সম্বল নয়। বাজনা বাদ্যি করে বৌকে একগা গহণা পরিয়ে গৌরীকে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন সন্তোষিণী গোবিন্দকে কাণ্ডারী করে।

এ সব অবশ্য চার পাঁচ বছর আগেকার কথা। শান্ত নম্র লক্ষ্মী মূর্ত্তি গৌরীকে, গোবিন্দর মতো তাচ্ছিল্য কেউ করেনা। তাছাড়া —সংসারের বহুবিধ কাজ তার কাছ থেকে পাওয়া যায়। অতএব—প্রত্যেক বিষয়ে—"বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা" বলেই উল্লেখ করা হয় তাকে।

এতোদিন এই ভাবেই চলছিলো—

তবে কিছুদিন থেকে সংসারে সকলের সবকিছু বিলাসিতার ওপর ছাঁটাইয়ের কাঁচি পড়ায়। আগুন হয়ে আছে সবাই।

নিজেদের অপব্যয়গুলো তারা ন্যায্য খরচই ভাবে, চোখ দেয় অন্যদিকে। আপাতত তাদের প্রধান টার্গেট গোবিন্দ। কাজে কাজেই "দুটো মানুষের খাওয়া-পরা"র খোঁটা সকলের মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়ে। যখন তখনই পড়ে।

সবথেকে বেশী বলে বিধবা মুরলা।

দু'বছরের ছেলে নিয়ে বাপের সংসারে ঢুকে সেই ছেলেকে যে উনিশ বছরের 'নদেরচাঁদটি' করে তুলেছে।

অবিশ্যি গোবিন্দর কিছুতেই দৃকৃপাত নেই। ওসব 'খোঁটা' তার গায়েও লাগে না।

সে মনের আনন্দে আধসের চালের ভাত মেরে দিয়ে হাঁক পাড়ে —ঠাকুর আর চারটি ভাত আনো তো—

ভাত নিয়ে বেরিয়ে আসে — ঠাকুর নয়, গৌরী। নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাশে।

সন্তোষিণী এদিক ওদিক তদারকী করছিলেন, আক্ষেপের স্বরে বলেন—আর ঠাকুর। সে মুখপোড়া আজ কেঁদে কেটে দেশে চলে গেলো মা মরছে বলে।

সুবিমল মন্তব্য করে—হুঁ মরছে। দরকার মাফিক মরবার জন্য ক'টা করে মা যে মজুত থাকে ব্যাটাদের। সব বাজে।

গোবিন্দ আশ্চর্য্যভরে বলে—তুমি বলো কি বড়দা? বাজে করে বলবে মা মরছে? ছি ছি কি যে বলো। তাই কখনো হয়?

—হয় না বুঝি ? ·· সুবিমল ওর সরলতায় ব্যঙ্গ হাসি হাসে।

সন্তোষিণী সস্নেহে বলেন—নতুন বৌমা ছেলেমানুষ, সাহস করে কোমর বেঁধে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে, তাই টুঁ শব্দটি নেই সংসারে। দাও নতুন বৌমা, ভাত দাও গোবিন্দকে।

গোবিন্দ বাড়তি ভাতগুলো সাপ্‌টে মাখতে মাখতে বলে—মামীর এক আদিখ্যেতার কথা! 'ছেলেমানুষ' মানে? পাঁচসেরি চালের হাঁড়িটা নামাবার বয়েস বুঝি তবে তোমার? বলি—আর বামুন রাখবার দরকারটাই বা কি? মামার এই পেন্‌সন হয়ে গেছে, এ খরচটা কমিয়ে দিলেই হয়।

সন্তোষিণী বলেন—সব্বনেশে কথা বলিসনি গোবিন্দ! বারো-মাস এই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে কে?

গোবিন্দ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—ঠেলবে, পাড়ার লোক। আচ্ছা—বৌদিদির নয় অভ্যেস নেই, নতুন বৌ পারেনা? তিনি তো আর জমিদারের ঘর থেকে আসেন নি? বলে দিও মামী। বিবিয়ানা ক'রে দিন রাত্তির উল্‌বোনা চলবে না, রাঁধবে কাল। কই আর দুটি ভাত দেখি।

শুনে সুবিমল কটমট করে তাকায়।—যেন "আবার ভাত?"

হঠাৎ পাশ থেকে ফিক্ করে হেসে ফেলে বলে—গোবিন্দকা' তুমি কি বক রাক্ষস? মা বলে তুমি চারজনের ভাত একলা খেতে পারো—তাই না গোবিন্দকা?

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলে—তা' পারবো কেন? তোর মার মতন আধছটাক চালের ভাত খাবো, আর এবেলা ওবেলা মূর্ছা যাবো। কেমন?

খেয়ে উঠে বেসুরো সুরে গান গাইতে গাইতে আঁচাতে যায়।

সুরেলা গান ভেসে আসে সন্ধ্যাবেলা তৈতলার ঘঁর থেকে।

মেজবৌ অর্গান বাজিয়ে চলেছে, গান গাইছে গীতশ্রী!···টেবিলে আঙুলে ঠুকে তাল দিচ্ছে সুব্রত। ছোট ছেলে মেয়েরা কেউ মন দিয়ে শুনছে, কেউ ঘরে বসে খেলা করছে।

মোটকথা ঘরের মধ্যে বেশ একটা জম্‌জমাট ভাব।

গান থামলে সুব্রত গীতশ্রীকে বলে—গানের চর্চ্চাটা ভালো করে করলে না ছোটমাসী? করলে রীতিমত গাইয়ে হতে পারতে।

মেজ বৌ আরক্ত মুখে বলে ওঠেন—হলেই বা লাভটা কী হতো সুব্রত? শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তো গলা খোলবাব হুকুম থাকবে না। নইলে—চর্চ্চা আমিও তো কম করিনি।

সুব্রত একটু ফাজিল প্যাটার্ণের, সে বন্ধ গলা খোলবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করতে থাকে মামীকে।···শেষ পর্য্যন্ত মেজবৌ গলা খোলেন, এক ওস্তাদি সুরে।···

···দোতলায় নিজের ঘরে কর্ত্তা একা বসে একজোড়া তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিলেন,···গানের তালে অন্যমনস্ক হয়ে যান।

আর একটা ঘরে সুবিমল ক্রশ্‌ওয়ার্ড পাজ্‌ল সলভ্‌ করবার চেষ্টায় ঘেমে উঠছিলো, সে বিরক্তিব্যঞ্জকভাবে ভ্রূ কুঁচকে হঠাৎ উঠে জানলাটা বন্ধ করে দেয়।

গোবিন্দ হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে আসে—নীচের তলায় সিঁড়ির পাশে তার নিজের ঘরে।···তাকের ওপর থেকে পেড়ে নিয়ে যায় ডুগি তবলা দুটো।

তার একান্ত প্রিয় বাজনা।

তেতলার বারান্দায় উঠে গিয়ে, বাজনা দুটো নিয়ে বসে পড়ে লাগায় জোর চাঁটি।

ঘরের মধ্যে থেকে গীতশ্রী বলে—ন্যুইসেন্স!···উঃ এই বর্ব্বর লোকটাকে সহ্যকরা কী দুরূহ!

মেজ বৌ মুচকি হাসেন।

নীচের রান্নাঘরে রান্না করছিলো গৌরী।

গানের সুর ভেসে আসে সেখানেও।···

সে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায় একবার, আবার মন দেয় কাজে।

কর্ত্তার তাস জমেনা।

উঠে পড়েন।

ধীরে ধীরে ঢোকেন এপাশের ঘরে···ওপাশের ঘরে। সব ঘর খালি···কিন্তু আলো জ্বলে যাচ্ছে আপন মনে। একটি একটি করে নিভিয়ে দেন। নেমে যান নীচের তলায়···সেখানেও নিভোতে থাকেন একটি একটি করে।

সিঁড়ির সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা যামিনীমোহনকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ দেখতে লাগে।

সন্তোষিণী দালানে বসে সুপুরি কাটছিলেন বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন —ওকি ছেলেমানুষি হচ্ছে?

—ঘরে ঘরে দেওয়ালির রোশ্‌নাই জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছোনা?

—পাবোনা কেন? তা' ভর সন্ধ্যেবেলা আলোগুলো নিভিয়ে ভূতুড়ে বাড়ী করে তুলছো কেন?

—রায়বাড়ীর ভেতরের আলো এমনি করে নিভে আসছে গিন্নি, তাই বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করছি।

—ও আবার কি অপয়া কথা! শুনলে গা জ্বলে যায়। তোমার যে কি হয়েছে আজকাল!

রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করেন সন্তোষিণী।

সত্যি "কি হয়েছেই" বটে!

নইলে—দিনের বেলাতেও নিঃশব্দে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ান যামিনীমোহন, জনশূন্য ঘরে পাখা ঘুরছে কি না তদারক করতে! ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আলো পাখা বন্ধ করে দিয়ে যাবার রেওয়াজ এ বাড়ীতে কোনোকালেই নেই। সে দিকে দৃষ্টিও ছিলোনা কারুর।

দৃষ্টিটা অকস্মাৎ ফিরছে বলেই কি অভ্যাসটাকে অকস্মাৎ ফেরানো যাবে?

হঠাৎ একদিন রাগ চড়ে যায়। আচম্কা চীৎকার করতে থাকেন—এতো নবাবি কেন? নভেম্বরের ষোলো তারিখ হয়ে গেলো আজ, এখনো—চব্বিশ ঘণ্টা পাখা চালানো হচ্ছে! একধার থেকে পাখার ব্লেড্‌গুলো খুলিয়ে রাখবো কাল। যাঁর বেশী গরম হবে, তিনি যেন মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে বসে থাকেন।

চেঁচামেচি যামিনীমোহনের স্বভাব বিরুদ্ধ। চেঁচানোর জন্যে কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখায় তাঁকে।

বাড়ীর সকলেই এদিক ওদিক থেকে মুখ বাড়ায়। কেউ ভুরু কুঁচকে, কেউ ত্রস্ত বিস্ময়ে। শুধু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সন্তোষিণী। ধিক্কারে দুঃখে লজ্জায় রাগে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন—তোমার জ্বালায় কি আমি পাগল হবো? কি সুরু করছো ক্রমশঃ?

যামিনীমোহন কণ্ঠকে আরো রাশ ছাড়া এগোতে দেন—সুরু করবোনা? ওদিকে যে সবদিক 'সারা' হয়ে আসছে। মাসে কতো

করে ইলেকট্রিক বিল্ দিচ্ছি জানো? ছেচল্লিশ আটচল্লিশ। এক পয়সা বার করছে কেউ নিজের গাঁট থেকে? এতো বাবুয়ানা কেন তবে, এতো বাজে খরচ কিসের জন্যে?

সন্তোষিণী গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলেন—আজ ওদের দুষছো কিন্তু জীবনভোর তুমিই কি কম বাজে খরচ করেছো? বুঝে চললে কি আজ এই অবস্থা হতো? জমার খাতায় কতো থাকতো, তার হিসেব করেছো কখনো?

সামান্য কথা, সাধারণ কথা। তবু—সন্তোষিণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যামিনীমোহনের সমস্ত উত্তেজনা কেমন অদ্ভুতভাবে থিতিয়ে যায়। সন্তোষিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তিমিত শান্ত কণ্ঠে বলেন—থাকতো? না? তাই বটে! জমার খাতায় কিচ্ছু রাখতে পারিনি কি বলো? তাই তো—জীবনভোর কি করলাম! অ্যাঁ! আমাকে দু'খানা খাতা দিতে পারো? একখানায় যোগের অঙ্ক কসবো, একখানায় বিয়োগের। ··· মিলিয়ে দেখবো···মিলিয়ে দেখবো···।

সন্তোষিণী শঙ্কিত দৃষ্টিতে বলেন—কি মিলিয়ে দেখবে?

—ওই যে, দেখবো কী করলাম সারা জীবন। এতো যে রোজগার করেছি, কি ভাবে খরচ করেছি তাকে! কতোটুকু কাজের খরচ করেছি, কতোখানি বাজে খরচ। ··· রাখলে কতোটা থাকতো। দুখানা খাতা চাই ··· দুখানা খাতা!

হাই ব্লাড্ প্রেসারের রোগী যামিনীমোহনকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ দেখায়।

সন্তোষিণী কোনো রকমে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন তাঁকে, ধীরে ধীরে বাতাস করেন মাথায়।

বুকটা কেমন কাঁপতে থাকে সন্তোষিণীর।

ওদিকে—অপমানে শয্যা নিয়েছেন মেজবৌ।

কারণ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও তাঁর ঘরে পাখা চলে। কাজেই গায়ে বেজেছে তাঁরই বেশী।

ক্রুদ্ধ এবং রুদ্ধ গর্জ্জনে তিনি পতিদেবতাকে বলতে থাকেন—আলাদা এস্ট্যাব্লিস্‌মেণ্ট করতে পারার ক্ষমতা নেইতো বিয়ে করবার সখ হয়েছিলো কেন? বাপের ভরসায় বিয়ে করা শুধু বোকামী নয়, আইনত দণ্ডনীয়।... রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিৎ এসব লোকের।... উঃ এইখানে পড়ে আছি বলেই না এতো অপমান?

পরিমল সান্ত্বনা ছলে বলে—বাবা তো আজকাল প্রত্যেককেই যা খুসি বলে বেড়াচ্ছেন, একা তোমাকে মীন্ করে কিছু—

—বোকোনা। বেশী বোকোনা তুমি। প্রধান লক্ষ্য আমি ত' জানো? আমি কিন্তু এই বলে রাখছি—আসছে মাস থেকে আলাদা ব্যবস্থা করা চাই। নাহলে—

পরিমল বলে—বাবা থাক্‌তে আলাদা হয়ে গেলে আমি আর এই বাড়ীর অংশ পাবো না জানো?

মেজবৌ তর্জ্জন থামিয়ে বলেন—তার মানে? কেন?

—ওই আইন! তাইতো এতো সয়েও চুপচাপ আছি। আর ক'টা দিনই বা? বাবার যে রকম হাই ব্লাড্‌প্রেসার, ক'দিন ভরসা?

পাশের ঘরে বড়বৌ কর্ত্তাকে বলছেন—মেজবৌ এবারে ঠিক আলাদা হবে। মরতে আমিই থাকবো পড়ে। বুড়ো শ্বশুরের গঞ্জনা খাবো, আর খেটে মরবো।

সুবিমল বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা অমনি হলেই হলো। কত ধানে কতো চাল পরিমল খুব বোঝে।

বড়োবৌ অভিমান স্ফুরিত অধরে বলেন — সবাই সব বোঝে গো, তুমিই হ্যাকা। এই যে মেজঠাকুরপো,—শুনতে পাই নাকি মোটা মোটা টাকার ইনসিওর করেছে—

সুবিমল রহস্যময় হাসি হেসে বলে — ও সব ইন্‌সিওর টিওর বুঝি না বাবা, খালি লোক জানাজানি। এমনভাবে রাখবো কাকে পক্ষীতে টের পাবে না।

—কাকে পক্ষীতে টের পাবেনা—মুরলা ছেলের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলে চলেছে — কাকে পক্ষীতে টের পাবেনা, নিয়ে যা তুই, বেচে দিগে যা।···যেমন অসাবধানে যেখানে সেখানে সোনার গয়না ফেলে রাখে, তেমনি জব্দ হোক।

মুরলার হাতে একটা সুদৃশ্য পেনডেণ্ট, আর একটা ঝুমকো পাশা!

হিতাহিত বুদ্ধিহীন স্নেহান্ধ মুরলা ছেলের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ছেলে যে এখন হাত খরচের জন্যে যথেচ্ছ টাকা পায় না। এতে যেন বুক ফেটে যায় তার।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।

দুর্ব্বুদ্ধি জাগে মুরলার মনে, দুর্ব্বুদ্ধি দেয় সে ছেলের কানে কানে।

অসাবধান মেয়ে গীতশ্রী কলেজ থেকে এসে যেখানে সেখানে খুলে রাখে গলার পেনডেণ্ট কানের ঝুমকো পাশা।··· রাখে বরাবরই হঠাৎ একদিন তার ওপর শ্যেন দৃষ্টি পড়ে মুরলার। এদিক ওদিক চেয়ে খুলে নেয় চুপি চুপি, ভাবটা যেন শুধু লুকিয়ে রাখবে, অসাবধানী মেয়ে একটু জব্দ হোক।

কিন্তু দু'তিন দিন কেটে যায়, খেয়াল হয় না গীতশ্রীর। ধীরে ধীরে মুরলার মধ্যে সৃষ্টি হয় লোভের। একদিন গায়ে পড়ে বলে—

গীতা তোর কানটা গলাটা খালি কেন? ঝুমকো কোথা গেলো? পেনডেন্ট?

গীতা অগ্রাহ্য ভরে একবার গলায় ও কানে হাত দিয়ে বলে — কে জানে বোধ হয় টেবিলের ড্রয়ারে!

মুরলা হিতোপদেশের ভঙ্গীতে বলে — দেখিস বাপু সাবধান!

গীতশ্রী বলে — হুঁ সাবধান। বাড়ীতে কে এমন চোর ডাকাত আছে, যে সর্ব্বদা সাবধান হতে হবে?

মুরলা চোখ টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে — বিশ্বাসই বা কাকে? এই যে হরি, অতোদিনের লোক, তোর বড়দার পকেট মারলো তো?

—আমি বিশ্বাস করিনা।

বলে চলে যায় গীতশ্রী, আর মুরলা কুটিল আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে চলে যায় ছেলের কাছে, ফিসফিস করে বলে—আমি বলছি তুই নিয়ে যা। কাকে পক্ষীতে টের পাবেনা। বেচে যা হবে খরচ করে ফেলবি — মা হয়ে আজ তোকে আমি কুমন্ত্রনা দিচ্ছি বটে, কিন্তু তোর শুকনো মুখ দেখলে যে বুক ফেটে যায় আমার—

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে মুরলা।

সুব্রত চাপা বিরক্তিতে বলে — দিলে তো দিলে এমন জিনিষ যে, ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ। ওতে আর ক'টা টাকা হবে? ক'দিনের খরচ? ছোটলোকের মতো নিঃশব্দে একা বসে হোটেলে খেয়ে আসতেও পারি না, একা বসে বসে সিনেমা দেখতেও পারিনা। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে গেলে—

মুরলা কাতরভাবে বলে — কি করি বল? বাবার আজকালকার মেজাজ দেখেছিস তো?

—তা আর দেখিনি — সুব্রত বলে — বুড়োর কাছে আর আধলার

পিত্যেস্ নেই। এক খোঁটা দিয়ে কথা বললেই টুবলবে — ঝি করবো দাদু, যখন ছিলো — তখন কি কিছুতে 'না' বলেছি'…?। কবে কী খাইয়েছেন, এখনো সেই গপ্পো মনে রাখতে হবে! আজকাল আবার কি এক বাতিক হয়েছে দেখেছো? চব্বিশ ঘণ্টা দু'খানা খাতা সামনে বেখে কী এক বিড়বিড় করে হিসেব করছে, আর খাতা দু'খানায় নোট করছে। ব্যাপারটা কি বলোতো?

—জানিনে বাবা! দেখবার হুকুম তো নেই, সেদিন একটু জিগোস করেছিলাম—কীযে পাগলের মতন উত্তুর দিলেন! বললেন—"সারা জীবনের লেনদেন আর লাভ ক্ষতির যোগ বিয়োগ দিচ্ছি!"…এ কথার মানে আছে?

—না কোনো মানে নেই—ক্রুদ্ধ সুবিমল মায়ের ওপর গর্জন করছে —কোনো মানে নেই তোমার এসব সেন্টিমেন্টের!‥ গয়না হারিয়েছে— তাকে বার করবার জন্যে যা খুসি করবো আমি। আজ গীতার জিনিশ হারিয়েছে কাল ওর বৌদিদের জিনিশ হারাবেনা, তার প্রমাণ আছে?… ছোট জিনিশ বলে যদি আজ অগ্রাহ্য করা হয়, কাল যথা সর্বস্ব যেতে পারে তা জানো? 'গুণিন্' এনেছি আমি, সবকটা ঝি চাকরকে 'চালপড়া' খাইয়ে ছাড়বো!

সন্তোষিণী বলেন—আহা চিরদিনের বিশ্বাসী লোক, কাজের লোক, ওদের ওভাবে উৎপীড়ন করলে মনে কষ্ট পাবে, কাজ ছেড়ে দেবে।

সুবিমল বলে—সেইটাই বলোনা পষ্ট করে, লোক ছেড়ে গেলে অসুবিধে হবে তোমাদের।…কিন্তু সে ভাবনা করিনা আমি, বাড়ীতে চোর পুষে রাখবোনা, সোজাকথা। 'চালপড়া' 'তেলপড়া' যে উপায়ে হোক বার করবো।

দালান ভর্ত্তি লোক। যামিনীমোহন বাদে জড়ো হয়েছে বাড়ীর সবাই।

একটা কদাকার চেহারার লোক এসে বিড়বিড় করে কী ছাই পাঁশ মন্ত্র পড়ে এক মুঠো চাল নিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে বলে "খা খা সবাই খা, যে নিয়েছে সে যমের বাড়ী যা"।

আতঙ্ক বিস্ফারিত চক্ষে সকলেই একটু পিছিয়ে যায়। ...সাহস করে কেউ খাবে এ ভরসা নেই।

ঝি-চাকর চারটের মুখে অনমনীয় ভাব।

চুরি না করুক, 'চালপড়া' খাবার সাহস কারুর নেই। তাদের ওপর তম্বি চালায় মুরলা—পিছিয়ে গেলে চলবে না, চালপড়া খেতেই হবে! দেখা যাক কে সাধু কে চোর। হাত পাত, পাত শীগগীর।

বলা বাহুল্য কেউই পাতে না।

হঠাৎ গোবিন্দ এগিয়ে আসে—মেয়েলি ভঙ্গীতে বলে—আ মরণ ভয়টা কি? নে না, খা কচমচিয়ে। কেঁপে মরছিস কেন? কই হে দাও তো দেখি তোমার চালপড়ার কী গুণ। দাও না হে—

গোটা কতক চাল মচমচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ঝি-চাকরগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলে—এই তো দেখলি? কি কচুপোড়া হলো? দুটো দুটো খেয়ে নিয়ে পাপ চুকিয়ে দে। সব্বাই লাগাও—কেউ বাকী থাকবে কেন? বড়দা, মেজদা, মামী, বড়বৌদি, মেজবৌদি, বড়দি—

সঙ্গে সঙ্গে কোঁস করে উঠে মুরলা—কী বললি হতভাগা—লক্ষ্মী-ছাড়া? আমি বিধবা মানুষ, ওই হলুদমাখা সেদ্ধচালগুলো গিলবো? যতো কিছু বলি না, ততো বাড় বেড়ে যাচ্ছে কেমন? ...মা, এই আমি তোমাকে বলে রাখছি—কিন্তু, নিজের বাপের বাড়ীতে বসে যদি এই

ভাবে দাঁড়িয়ে অপমান হতে হয়, তা'হলে ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যাবো। পথে পথে ভিক্ষা করে খাই সেও মাস্তের।

সন্তোষিণী সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—এই সামান্য কারণে মন খারাপ করিস না মুরলা! ওই পাগলটার কথা আবার মানুষে ধরে?

ওদিকে — সুব্রত হাতমুখ নেড়ে চাকর দুটোকে শাসাতে থাকে।

একটা চাকর হঠাৎ গলা ছেড়ে প্রতিবাদ করে ওঠে—না বাবু না, ওসব সহ্য করবো না। গরীব পেয়েছেন বলে খামোকা চোর বলবেন?

সুব্রত ব্যঙ্গোক্তি করে ওঠে — আহাহা। ইস্।…চোর বলবো কেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস" বলবো তোমাদের।…সব কটা — একের নম্বরের চোর।…মার লাগালে তবে সব শায়েস্তা হয়।

চাকরটা বলে — খবরদার বাবু ওসব মার ধোরের কথা বলবেন না। গরীব পেয়ে যা খুসি করবেন, সে কাল চলে গেছে। এ হচ্ছে স্বাধীন গভোরমেন্টের রাজ্য।

টিট্‌কারি দিয়ে ওঠে পরিমল — হুঁ বড়ো যে আজকাল লম্বা চওড়া কথা শিখেছিস দেখছি তোরা। বলি কেউ যদি না নেয় বাড়ী থেকে জিনিশ উড়ে যাবে নাকি?

…রীতিমত ঝড় বইতে থাকে জায়গাটায়।

মেজ কর্ত্তার কথার সায়ে মেজগিন্নী এককথা বলেন, তার প্রতিবাদে বড়োগিন্নী আর এককথা বলেন, সন্তোষিণী এদের মাঝখানে কিছু বলবার চেষ্টায় হাঁকাহাঁকি করতে থাকেন, গোবিন্দ দুই হাতের মুঠোয় দুই গাল ঠেকিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে দেখা যায় গৌরী বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে।…

চালপড়া হাতে কদাকার লোকটা আরো কদাকার মুখ করে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকে।

ঠিক এই সময় সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসেন যামিনীমোহন।

মুহূর্তে সব নিঃশব্দ হয়ে যায়।

একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দিক তাকিয়ে যামিনীমোহন শ্লেষের সুরে বলেন—কিসের অ্যাকটিং হচ্ছে এখানে?

কেউ উত্তর দেয়না।

—কি? সবাই হঠাৎ নীরব হয়ে গেলে যে? পালাটা তো বেশ জোর চলছিলো। কিসের পালা? মশক বধ কাব্য?

এবারে পরিমল ঈষৎ বিরক্ত সুরে উত্তর দেয়—কিছুর তো খোঁজ রাখেন না, হঠাৎ একটা দিকে নজর দিলে আর কি হবে? বাড়ী থেকে সোনা রূপোর জিনিশ পর্য্যন্ত—পাখামেলে উড়ে যাচ্ছে আজকাল।

—যাচ্ছে বুঝি যামিনীমোহন হেসে ওঠেন।—হেসে বলেন—ওটা তো কিছু নতুন কথা নয় পরিমল, সোনারূপো জিনিশটার চিরদিনই পাখা গজায়, সুযোগ পেলেই ওড়ে। রায়বাড়ীতে আরো কতো কি উড়তে আরম্ভ করেছে আজকাল, লক্ষ্য করেছো? উড়ছে—রায় বাড়ীর সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা সহবৎ। উড়ছে—লজ্জ সরম, মান ইজ্জৎ। একে একে সব উড়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করোনি?··· অতঃপর গুনিন্‌টার দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমায় কে ডেকে এনেছে বাপু?

লোকটা সভয়ে সুবিমলের দিকে তাকায়।

—হুঁ।···কতো মজুরি কবলেছে?···ভয় করবার দরকার নেই—বলে ফেলো। কতো মজুরি তোমার?

—পাঁচ সিকে।

—এই নাও। নিয়ে গেটের বাইরে চলে যাও।

পকেট থেকে বার করে দেন দুটো টাকা।

সুবিমল বিরক্তভাবে প্রতিবাদ করে—এর কোনো মানে হয় না! লোকটাকে ডাকা হয়েছিল—ওর ক্যাপাসিটির পরীক্ষা হয়ে যেতো! তাড়িয়ে দেবার দরকার কি ছিল।

যামিনীমোহন বড়ছেলের ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বলেন—দরকার হয়তো একটু ছিল সুবিমল! সত্যিই যদি ওর কোন ক্যাপাসিটি থাকে, পরীক্ষাটা অন্যদিকে মারাত্মক হয়ে উঠতো কিনা কে বলতে পারে। Shoshi Bushan Roy.

যামিনীমোহন আবার উঠে যান ওপরে।

গোবিন্দ হঠাৎ সকলের পাশ কাটিয়ে পিছন পিছন উঠে যায়। ওব ভাবনা হয় মামা পড়ে না যান। শুনেছে ব্লাডপ্রেসার রোগীর পক্ষে রাগটা নাকি মারাত্মক।

চাকর বাকরগুলো এদিক ওদিক সরে যায়। সন্তোষিণীও যান।

বাকী সকলের সামনে মুরলা চাপা গলায় হাতমুখ নেড়ে বলে—আমার নিশ্চয় মনে নিচ্ছে, আর কেউ নয়; এ ওই গোবিন্দ মুখপোড়ার কাজ! দেখছো না কি রকম সুযোগিগিরি করে পেছন পেছন উঠে যাওয়া হলো। হরি গিয়ে পর্য্যন্ত, সব সময় হরির মতন বাবার হাতে হাতে মুখে মুখে ফরমাস খাটা হচ্ছে। কথাতেই আছে বাবা, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ! এই আমার সুব্রত কই বলুক দিকিন কেউ, ও কারুর খোসামোদ করছে। তোরাও তো সবাই ওর মামা!

—থাক বড়দি, সুব্রতর তুলনা আর দিও না। আরো অসহ্য। ...বলে মুরলার সমস্ত উৎসাহে বরফ জল ঢেলে দিয়ে চলে যায় নির্মল।

গোবিন্দ ওপরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—মামা মাথা ঘুরছে না তো। মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে যে—কি দরকার ছিলো বাপু তোমার, এই সিঁড়ি ওঠা উঠি করা। —ওরা চালপড়া তেলপড়া করে মরছিলো মরতো। …নাও একটু শুয়ে পড়ো। প্রায় জোর করেই শুইয়ে দিয়ে পাখার রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দেয়।

যামিনীমোহন মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলেন—তোর কি মনে হয় বলতো গোবিন্দ ?

—কিসের মামা ?

—কে নিয়েছে জিনিশটা ?

—কে জানে মামা, কাগেও নিয়ে যেতে পারে।

দুই হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গি করে গোবিন্দ।

যামিনীমোহন চোখ বুজে শুয়ে থাকেন।

ঘুমন্ত ভেবে গোবিন্দ নেমে যায়।

নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে সুব্রত, টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের টিনটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে গোটা কয়েক সিগারেট বার করে নিয়ে পকেটে পোরে।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকান যামিনীমোহন।

—কে ও ? ওঃ সুব্রতবাবু ?…বুড়ো হঠাৎ জেগে ওঠায় বড়ো বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছো না ? আহা।

সুব্রত একটু ইতস্ততঃ করে বলে ওঠে—কেন কি হয়েছে কি। আপনার রিষ্টওয়াচটায় দেখছি দম দেওয়া হয়নি, বন্ধ হয়ে রয়েছে।

ভাবটা যেন টেবিলে পড়ে থাকা ঘড়িটাই লক্ষ্য করছিলো সে।

যামিনীমোহন হেসে বলেন—আর ঘড়ি! ঘড়ির মালিকেরই দম

বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ...কিন্তু তোমাকে আজকাল বড্ডো অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে, তাই না, বিব্রতবাবু।

—অসুবিধে কি। কিসের অসুবিধে।

ফাঁকা ফাঁকা উত্তর দেয় সুব্রত।

—আর কিছু নয়। কতকগুলো সদভ্যাস করে ফেলেছো, এখন তার রসদ জোটানো শক্ত হচ্ছে। এই আর কি। ...আমারই অন্যায়। অসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি চিরদিন। ...ভাবতাম—দুহাতে পয়সা ছড়িয়ে, সকলের আশা মিটিয়ে দেবো। ...হাত দুটো যে একদিন পঙ্গু হয়ে যাবে, খেয়াল করিনি কোনদিন।...

শেষের কথাগুলো প্রায় আত্মস্থভাবেই বলেন যামিনীমোহন। বলে চোখ বোজেন। নিমীলিত দুই চোখের কোণ বেয়ে ছোট্ট দুটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

সুব্রত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে যামিনীমোহন তাকান।

শান্তস্বরে বলেন—দাদুভাই শোন!

—কি বলছেন।

—ওই ড্রয়ারটা খোল। ডান দিকেরটা নয়, বাঁ দিকেরটা।...

সুব্রত ব্যাপারটা বোঝে না। ড্রয়ার খোলে।

যামিনীমোহন বলেন—কি আছে ওখানে দেখতো। ক'টা টাকা।

—সাত টাকা চোদ্দ আনা।

—আচ্ছা! টাকা ক'টা নিয়ে যাও তুমি, চোদ্দ আনা থাক। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা, কি বলো।

সুব্রত অপ্রতিভ মুখে বলে—এ টাকা কি হবে?

যামিনীমোহন আবার চোখ বোজেন। বিষণ্ণ কৌতুকে বলেন—নিয়ে যাও। যে কয়টা দিন অপরের শৈশাব ভাঁড়ারে সিঁধ না দিয়ে চলে! সব সহ্য হয় ভায়া। আমার গিন্নীটি আর ওই টিনটি, এই দুটি বস্তুর কারুর নজর পড়লে সহ্য হয় না।

সুব্রত মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ায়, তারপর এক সময় বোঁ করে বেরিয়ে যায়। অবশ্য টাকা ক'টা পকেটস্থ করেই।

কিছুক্ষণ পরে সন্তোষিণী ঘরে ঢোকেন।

ঘরের এদিক ওদিক টুকিটাকি গোছান। পাখাটা একটু কমিয়ে দেন, জানালার পর্দ্দাটা টেনে দেন·· জীর্ণ বিবর্ণ পর্দ্দাগুলো, একসময় দামী ছিলো বোঝা যায়। আব দামী ছিলো বলেই যেন দৈন্যটা বেশী চোখে পড়ে।

অতঃপর টেবিলের কাছে এসে সিগারেটেব টিনটা খুলে দেখেন। দেখে চমকে উঠে সবিস্ময়ে বলেন—অ্যাঁ এরি মধ্যে এতোগুলো খেয়ে ফেলেছো!···এতো গুলো খেলে কখন? এই তো সকালে ভর্ত্তি টিন ছিলো।

চিরদিনের কৌতুকপ্রিয় যামিনীমোহনেব মুখে একটু মৃদুহাসি ফুটে ওঠে।

—জীবন ভোর কতো ভর্ত্তি টিন খালি করলাম, আজ ওই ক'টায় আশ্চর্য্য হচ্ছো?

সন্তোষিণীর মুখেও অনেকদিন পবে একটু স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে উঁচু পালঙ্কের ওপর গুছিয়ে উঠে বসে হাসিমুখে বলেন—চিরদিন যা করেছো, চিরকাল তাই করা চলবে?

—চলেনা—না? কিন্তু কেন চলে না বলো তো?

যামিনীমোহন আস্তে আস্তে নিজের ডান হাতখানি সন্তোষিণীর একখানি হাতের ওপর রাখেন।

অনির্ব্বচনীয় একটা ভাব ফুটে ওঠে দু'জনের মুখে।

যেন বাইরের দুর্য্যোগে বিক্ষুব্ধ দু'টি প্রাণী, সন্ধান পেয়েছে এক পরম আশ্রয়ের।

তিন

ক'দিন পরে—

খাবার দালানে রাত্রে খেতে বসে গোবিন্দ চেঁচায়—বড়দি, বড়দি শোনো এদিকে। আঃ কানের মাথা খেয়ে বসে আছ নাকি সব?

মুরলা বিরক্তচিত্তে এসে দাঁড়ায়।

ঝঙ্কার দিয়ে বলে—কি হয়েছে কি। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন?

—নাঃ তা চেঁচাব কেন। তোমরা সব কানে তুলো গুঁজে বসে থাকবে, আর আমি কোকিল স্বরে কুহু করবো! ···দুধ আনো দিকি একবাটি, বেশ বড় দেখে বাটির। তোমার তো আবার যে ছোটো নজর, একটা মধুপর্কের বাটিতে দুধ এনে হাজির করবে হয়তো!

মুরলা আরও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, আমার ছোটো নজরের গুণেই তো সংসারের আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে। তা বলি খুব তো লম্বা হুকুম হচ্ছে। বড়ো—একবাটি দুধে হবে কি। কোন নারায়ণের ভোগ লাগানো হবে?

গোবিন্দ হা হা করে হেসে ওঠে—তা' বলেছো প্রায় কানঘেঁসে। নারায়ণের নয়, শ্রীমান গোবিন্দর ভোগ লাগাতে হবে। ···দেখছো কি হাঁ করে। বুকে রোলার তুলবো এবার। রোলার জান তো। এ বছরে রোলার, আসছে বছর মটরগাড়ী। ···আমাদের জিমন্যাস্টিক ক্লাবের এ্যান্নুয়াল কম্‌পিটিশন হচ্ছে, বুঝলে? ···কিছুদিন ভাল করে ঘি দুধ মাছ মাংস খেয়ে নেওয়া দরকার।

মুরলা বিদ্রূপ কুঞ্চিত মুখে বলে—দরকার তো বুঝলাম! আসবে কোথা থেকে?

—আসবে আকাশ থেকে। বলি—যাঁরা নাদুস নুদুস দেহখানি নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার তলায় পড়ে থাকেন, তাঁদের ভাগে একটু কম পড়লেই বা! আমার দরকারটা দেখতে হবে তো? বুকে রোলার তোলা,—চারটিখানি কথা নয় বুঝলেন মশাই? যাও যাও, দুধটা আনো, খাওয়া হয়ে গেলো যে।

মুরলা ঠোঁট উল্টে বলে—মুখ্যু আর কাকে বলে, মুখ্যু কি আর গাছে ফলে? উনি গুণ্ডামী করতে যাবেন, আর বাড়ীর সবাই শুঁটকে থেকে ওঁকে দুধটি খাওয়াবে! হুঁঃ। পাঁচজনের ভাগ থেকে কেটে তোকে দুধের বাটি এনে দিতে দায় পড়েছে আমার! ভারী একেবারে বাপের ঠাকুর!

গোবিন্দ সাশ্চর্য্যে বলে—বাঃ বেশ! তা'হলে আমার গতিটা কি হবে? দুধ ঘি মাছ মাংস এসব না খেলে গায়ে জোর বাড়ে? কম্‌পিটিশনে হেরে গেলে বুঝি খুব মুখ উজ্জ্বল হবে তোমাদের?

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সন্তোষিণী—হাতে একবাটি দুধ। নামিয়ে দেন গোবিন্দর পাতের কাছে। ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলেন — ওসব কি ছাই পাঁশ খেলা গোবিন্দ? হাত পা নিয়ে 'চাল্লি' করিস, সে বরং ভালো, বুকের ওপর রোলার মোলার তোলা কি খেলা?

— ওই তো খেলা গো মামী! ঘরে বসে তাসখেলাকে কি আর খেলা বলে? এরপর বুকে হাতী তুলবো, বুঝলে? হাতী!

পরমানন্দে বাঁ হাতটা দিয়ে নিজের বুকের ওপর থাবড়া মারে গোবিন্দ।

মুরলা অস্ফুটে বলে — গলায় দড়ি! গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গিয়ে জব্দ হয় একদিন তো বেশ হয়।

গোবিন্দ উল্লিখিত "নাদুস নুদুস চেহারা" এবং "পাখার তলায় নিয়ে শুয়ে থাকা" বাড়ীতে বেশ একটু ঢেউ বয়ে যায়! গোবিন্দর দুঃসহ স্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত বড়বৌ রান্নাঘরে ভাড়ার ঘরে আস্ফালন করতে থাকেন, মেজবৌ আরক্তমুখে এক আধটা শক্ত শক্ত মন্তব্য করেন, মুরলা সন্তোষিণীর বুদ্ধির এবং গোবিন্দকে আস্কারা দেওয়ায় ধিক্কার দেয়। আর নতমুখী গৌরী নীরবে সমস্ত মন্তব্য হজম করে গুছিয়ে গুছিয়ে খেতে দেয় সকলকে। হাঁড়ি হেঁসেল গোছায়। বাটিতে বাটিতে দুধ গরম করে!

বড়বৌ যখন মন্তব্য করেন — অন্য সংসার হলে পরগাছার এতো বাড় বাড়তোনা। নেহাৎ নাকি বাবো ভূতের সংসার তাই, বড়ো-বৌয়ের নিজের সংসার হলে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়তেন। তখনো নীরব থাকে গৌরী। অশ্রুজলের সাক্ষী থাকে শুধু ভাতের থালাটা।

তারই মাঝখানে একবার মুরলা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে — কি গো নতুন বৌ, তোমার আবার কি হলো? পাতের ভাত নড়ছে না কেন? কর্ত্তার মতন রাবড়ি রসগোল্লা চাই নাকি?

সিঁড়ির পাশের একতলার ছোট্ট ঘরটা। সময়টা মাঝ রাত্রি।

গোবিন্দ শুয়ে শুয়ে ঘামছে, আর গৌরী নিঃশব্দে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করছে। এঘরে পাখা নেই। হঠাৎ একসময় গোবিন্দর চমক ভাঙে — একী তুমি ঘুমোওনি এখনো? ওকি চোখে জল কেন? সর্দ্দি হয়েছে? মাথা ব্যথা করছে? টিপে দেবো? কি মুস্কিল! বাকরোধ হয়ে গেলো নাকি?

গৌরী হঠাৎ পাখাখানা ফেলে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।...... সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে ওঠে তার কান্নার আবেগে।

গোবিন্দ নিরীক্ষণ করে বলে — হুঁ বুঝেছি! পেট কামড়াচ্ছে!... বলতে হবেনা, খুব বুঝেছি। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে, কেমন? বলতে হয় এতোক্ষণ? তা' নয় বসে বসে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে কাঁদছে! রোসো মামীর ঘর থেকে যোয়ানের আরক নিয়ে আসি একটু! খাবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনে জল পড়বে।

গোবিন্দ উঠে যোয়ানের আরক আনার তোড়জোড় করতেই গৌরী উঠে বসে ওর হাত ধরে ফেলে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে — তুমি কি সত্যি পাগল? ওঁরা তো তা'হলে মিথ্যে বলেন না। সত্যি তোমার কি কোনো বোধ শোধই নেই?

— জানিনা বাবা!... গোবিন্দ দুই হাত উল্টে বলে — হেঁয়ালি ফেঁয়ালি বুঝিনা। কি বলবে পষ্ট করে বলো, ব্যস মিটে যাক!

গৌরী স্থির স্বরে বলে — বলছি তুমি কি কিছুই করতে পারো না?

— পারি না মানে? কোনটা পারি না তাই শুনি?

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বালিশের ওপর চাপড় মারে গোবিন্দ।

কোনটা পারো? পুরুষ মানুষে কে না রোজগার করে, তুমি কই পারো? বটঠাকুররা, নির্ম্মল ঠাকুরপো, সকলেই তো রোজগার করছেন—

গোবিন্দ অবজ্ঞাভরে বলে — ওঃ রোজগার!... তা' কি করবো? বি এ, এম এ, প্যাশ করলে, সবাই অমন কোটপেন্টুল পরে আপিস যেতে পারে। বলি বুকের ওপর রোলার তুলতে পারে তোমার

বটঠাকুররা ? আমার মতন তবলায় বোল্ তুলতে পারে তোমার নির্ম্মল ঠাকুরপো ? হুঁঃ !

গৌরী মিনতির ভঙ্গীতে বলে — মাথায় দায়ীত্ব চাপলে, তুমিও যেমন করে হোক দুটো পেট চালাতে পারবে।...চলোনা গো, আমরা কোথাও চলে যাই।

গোবিন্দ অবাক দৃষ্টিতে বলে —চলে যাই মানে ? বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো কোথায় ? যাবোই বা কেন খামোকা ?...আমায় বলে পাগল ! মাথাটা তোমারই খাবাপ হয়ে গেছে নতুন বৌ !

গোবিন্দর ক্লাবের মাঠে আজ প্রতিযোগিতার আসর।

ছেলেদের সমবেত সঙ্গীত...ব্যাণ্ড পার্টি পুলকিত দর্শক জন।... গোবিন্দর বাড়ী থেকেও এসেছে কেউ কেউ। কুচোকাচা ছেলেরা, দুটো চাকর, রায় বাহাদুব স্বয়ং। পাড়াব মাথা তিনি। তিনিই আজ এ সভার প্রেসিডেন্ট।

মোটা একগাছা ফুলের মালা চেয়ারের হাতলে ঝুলছে ! সামনে টেবিলে ফুলের তোড়া।

নানা জনের নানা খেলা চলেছে।

গোবিন্দর ভাগ্যে বারবাব জুটছে প্রশংসার করতালি।...

ভাইপো ভাইঝিরাও উল্লসিত আনন্দে সেই করতালিতে যোগদিচ্ছে। রায় বাহাদুর শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় দেখছেন গোবিন্দর অসম সাহসিকতা ! এক এক সময় ভয়ে চোখ বুজছেন !

গোবিন্দকে কি এতো ভালোবাসেন তিনি ?

নিজেই অবাক হয়ে যান রায় বাহাদুর যামিনীমোহন। গোবিন্দকে তো কোনোদিন ভালো করে তাকিয়েও দেখেননি আগে। সংসারে

আছে—থাকে, খায় দায়! লেখাপড়া শিখলোনা বলে তার প্রতি বরাবর বরং একটা অবজ্ঞাই ছিলো।

তবে? গোবিন্দর বুকে রোলার তোলা দেখে রায় বাহাদুর যামিনী-মোহনের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে কেন?

মূর্খ, বর্ব্বর, গোঁয়ার, গোবিন্দ কোন ফাঁকে জায়গা করে নিয়েছে রায় বাহাদুর যামিনীমোহনের শিক্ষিত সভ্য মার্জ্জিত চিত্তের একটি কোণে?

ক্লাবের সেক্রেটারী এসে গোবিন্দর অজস্র গুণগাণ করতে থাকেন যামিনীমোহনের কাছে।···ফিরিস্তি দেন কবে কোথায় কি অসম সাহসিকতার কাজ করেছে সে, নির্ব্বিচারে করেছে পরোপকার।

ভদ্রলোক অনেক কিছু বলে শেষ পর্য্যন্ত সহাস্যে বক্তৃতার উপসংহার করেন—ছেলেটা একটু বোকা বটে, কিন্তু ভারী সরল। মহাপ্রাণ ছেলে। ···আর ওর একমাত্র গর্ব্বের বস্তু কে জানেন তো? আপনি! দলের ছেলেরা ওকে "রায় বাহাদুরের ভাগ্নে" বলে ক্ষ্যাপায়, ওর তা'তে মহা আনন্দ!

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন যামিনীমোহন। বিনয়সূচক প্রতিবাদ করতেও ভোলেন।

সব কিছুর শেষে—

বিজয় গৌরবে উৎফুল্ল গোবিন্দ দু'হাতে বয়ে নিয়ে আসে পুরস্কার-লব্ধ ভারী ভারী দুটো 'কাপ'। এনেই দুম্ করে বসিয়ে দেয় যামিনী-মোহনের পায়ের কাছে।

যেন অনেক সাধনায় অর্জ্জিত পুষ্পমাল্য নিয়ে এসে, অর্পণ করলো আরাধ্য দেবতার পদপ্রান্তে।—

রায়বাহাদুর তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন!

বেবু ক্লণু চাঁদু হৈ হৈ করে ওঠে।··আশপাশের সমস্ত দর্শক হাত-তালি দিয়ে স্ফূর্ত্তির হাসি হাসতে থাকে।

অভিভূত যামিনীমোহন গোবিন্দর দুই কাঁধে দুই হাত রাখেন।··· কষ্টে রুদ্ধ কণ্ঠে পরিষ্কার করে বলেন—হাড়গোড়গুলো আস্ত আছে তো হতভাগা ?···প্রাণটা আছে খাঁচার মধ্যে ?

গোবিন্দ হঠাৎ মাথাটা নীচু করে।

কেন কে জানে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ বর্ব্বরের চোখ দিয়ে ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে!

গৌরী বসে আছে জানলায়!

মুরলা এসে বলে—একী গো নতুন বৌ, আকাশ পানে চেয়ে বসে আছো যে ? ভাসুরদেব অফিস থেকে ফেরবার সময় হয়ে গেলো এখনো ময়দা মাখা হয়নি, কুটনোকোটা হয়নি, কি ব্যাপার ? ওদিকে উনুন জলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে!···তখনি বলেছিলাম মাকে বামুন ছাড়িয়ে দিয়ে ক'দিন চলবে ?

কে জানে কোন ফাঁকে সমগ্র সংসারের দায়ীত্ব এসে পড়েছে এই ছোট্ট মেয়েটির মাথায়।···নিজেই সে স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে নিয়েছে সমস্ত কাজ।···হয়তো ভাবে গোবিন্দর অক্ষমতার ত্রুটি যদি তার কাজের দ্বারা কিছু পূরণ হয়।

মুরলার ডাকে চমকে উঠে পড়ে সে।

বড় বৌ মুচকি হেসে বলেন—নতুন বৌ কি আর আজ এখানে আছে ? দেহটাই আছে, মন প্রাণ ক্লাবের মাঠে পড়ে আছে।··· আহা, কর্ত্তা বুকে রোলার তুলছেন, ভেবে ভেবে গিন্নীর বুক দশহাত হয়ে উঠছে গো। তাই জানলা পানে তাকিয়ে দেখছেন কখন কলির ভীম বুকে সোনার মেডেল ঝুলিয়ে বাড়ী ফেরেন!

গৌরী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢোকে।···

এই সময় সিল্কের ব্লাউস, হাইহীল্ জুতো, ভ্যানিটিব্যাগ, লিপষ্টিক কাজলে সজ্জিত: মেজ বৌ এসে দাঁড়ান—নতুন বৌ! এ কি? কী ব্যাপার? এখনো চায়ের জলটা পর্য্যন্ত চাপাওনি? আশ্চর্য্য! চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে বটে আজকাল। আচ্ছা থাক্, এমনিই যাচ্ছি, বাইরে খেয়ে নেবো।···গটগট্ করে চলে যান তিনি।

গৌরী ছুটে গিয়ে আগলায়।—

বলে — দাঁড়ান মেজদি, দু'মিনিট। চটকরে এক কাপ চা করে দিচ্ছি। জানতাম না তো আপনি বেরোবেন। জানলে এতোক্ষণে —

মেজবৌ টানা তীক্ষ্নস্বরে বলেন — এর আর জানাজানি কি? দু' ঘণ্টার জন্যে একটু সিনেমায় যাবো, সে খবর বাড়ীশুদ্ধু লোককে ধরে ধরে জানিয়ে রাখা উচিৎ ছিলো বুঝতে পারিনি। থাক না থাক্, অতো কষ্ট করবার কী দরকার!

গৌরী তবু তাড়াতাড়ি কেটলী নিয়ে চড়াতে যায়।

কোনখান থেকে গীতশ্রী এই অপূর্ব অভিনয়ের দর্শকের পার্ট গ্রহণ করেছিলো কে জানে, এখন নেমে আসে মঞ্চে।

কঠিন দৃঢ় হস্তে গৌরীর হাত থেকে কেটলীটা নিয়ে নামিয়ে রেখে, মেজবৌয়ের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে — রূঢ় গলায় বলে — নাঃ, কিছু দরকার নেই নতুন বৌদি. রেখে দাও। কলকাতা সহরে পথে বেরিয়ে কেউ চায়ের অভাবে গলা শুকিয়ে মারা পড়ে না। ··· কই কোথায় তোমাদের ময়দা আছে দাও তো মেখে দিচ্ছি। ··· তুমি ততক্ষণ কুটনো কুটে নাও।

গৌরী কুণ্ঠিতভাবে বলে — তুমি এইমাত্র কলেজ থেকে খেটে খুটে এলে ঠাকুরঝি !

—আরে দূর, সে তো দেড়ঘণ্টা হয়ে গেছে। …আমারও বড্ডো অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিছু করা দরকার। … কাল থেকে আমাকে দিও দিকিন কিছু কিছু কাজ।

পাঁচ

দিন যায়। ···সংসারের ধূমায়িত অশান্তির আগুন উত্তরোত্তর আত্মপ্রকাশ করে।

যামিনীমোহন আর একটু খিটখিটে হন, সন্তোষিণীর শিথিল মুষ্টি থেকে সংসার তরণীর হালটা আর একটু খসে পড়ে।···

শুধু বিকার নেই গোবিন্দর আর বোধশোধ নেই ছোট ছেলেমেয়ে-গুলোর।

গোবিন্দর বুকে রোলার তোলার পর থেকে 'গোবিন্দকা'কে তারা প্রায় পূজো করতে সুরু করেছে। ছাড়তে চায় না। ···গোবিন্দ লিলির চেন্ ধরে বেড়াতে যায়; আগে পিছে দেবু রুণু, হয়তো বা মণি চাঁদু গোবিন্দর স্কন্ধে।

গোবিন্দ তবলা সাধে, ওরা এসে কাড়াকাড়ি করে তবলায় চাঁটি দেবার জন্যে। ··· ওদের জগৎটা যেন আলাদা। — সেখানে মালিন্য নেই অসন্তোষ নেই, হিংসে নেই কুটিলতা নেই।

শুধু সব সময় সজাগ দৃষ্টি থাকে গোবিন্দর, যামিনীমোহনের সুবিধে অসুবিধের প্রতি।

জুতো ঝেড়ে গুছিয়ে রাখে, খাটের তলায়, সিঁড়ির পাশে। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলে। নিয়মিত মাখিয়ে দেয় তেল, কাছে থাকলেই হাতের কাছে এগিয়ে সিগারেটের টিন, বেরোবার সময় হাতে তুলে দেয় ছড়ি!

যামিনীমোহন অবসর পেলেই সামনে সেই খাতা দু'খানা মেলে ধরে বিড়বিড় করে মিলোতে থাকেন সারা জীবনের খরচের হিসাব। ··· পাগলামী ছাড়া আর কি?

এমনি হঠাৎ একদিন সুব্রত এসে গীতশ্রীকে অনুরোধ করে বসে — ছোটমাসী একটা কথা রাখবে?

— বলুন কি হুকুম?

— আঃ আগে থেকেই ঠাট্টা সুরু হলো তোমার? বলছি— একটু দেশের কাজ করো না?

— দেশের কাজ? সেট' আবার কি চারপেয়ে বস্তু?

— জানি তুমি খালি হেসে ওড়াবে। ··· কথা হচ্ছে — আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা "চ্যারিটি পারফরম্যান্সের" আয়োজন করছি বুঝলে? তাইতে —

গীতশ্রী বাধা দিয়ে বলে — তা' চ্যারিটিটা কাদের জন্যে? তোমাদের এই বন্ধু গোষ্ঠির জন্যে বোধ হয়? আহা বেচারা তোমরা! সত্যি এমন দুঃস্থ আর কে আছে? সপ্তাহে পাঁচদিন বৈ সিনেমা দেখতে পাচ্ছোনা, দৈনিক একটির বেশী সিগারেট পোড়াতে পাচ্ছো না, মাসে পাঁচ-সাতদিন ছাড়া হোটেল রেষ্টুরেন্টে খাওয়া জুটছে না, এর থেকে শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে?

— নাঃ ছোট মাসী, তুমি কখনই সীরিয়াস হতে পারবে না। টাকা তুলবো আমরা, —রেফিউজিদের জন্যে। ··· উঃ দেখোনি তো গিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে? দেখলে — জ্ঞান থাকে না। ··· দুটো চারটে লোকেরও যদি উপকার করতে পারি —

সুব্রতর কথার সুরে নাটকীয় আবেগ।

গীতশ্রী হেসে বলে—তুই করবি পরোপকার? ··· পরের দুঃখু

দেখে তোর বুক ফাটে? বড্ডো যেন ভূতের মুখে রামনামের মতো শোনাচ্ছে রে?

— ওই তো ছোটমাসী, ভালো কাজ করতে গেলেই লোকের সন্দেহভাজন হতে হবে জগতের রীতিই এই। অথচ আমার এক বন্ধু, যদিও আমার চেয়ে কিছু বড়ো, সুরেশ লাহিড়ী, কী দুর্দ্দান্ত বড়লোক, তিনখানা গাড়ী আছে তাদের বাড়ীতে, সে পর্য্যন্ত সেদিনকে শেয়ালদায় গিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

গীতা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হেসে ওঠে — দেখিস ভদ্দরলোক সেই অশ্রুসাগরে নিজে ভেসে চলে যায়নি তো? টেনে আনতে পেরেছিলি?

সুব্রত রেগে ওঠে — থাক তবে বলবো না। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে সে তো মানবে না তোমরা? ··· সুরেশ লাহিড়ীই তো এই প্রস্তাব তুলেছে। ও বলেছে গোড়ায় সমস্ত খরচা ও দেবে, তারপর টিকিট বিক্রীর টাকা থেকে খরচাটুকু তুলে নিয়ে লাভের টাকা সমস্ত দিয়ে দেবে উদ্বাস্তু ভাণ্ডারে।

গীতশ্রী বলে — লাভ থাকবে তো? কিন্তু এতো ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বাপু? তারচেয়ে তোর সেই দুর্দ্দান্ত বড়লোক বন্ধু নিজেই চারটি টাকা দিয়ে দিক না সাহায্য ভাণ্ডারে?

— বাঃ। তাহলে আর পাঁচজনের মনে প্রেরণা জাগানো যাবে কি করে? নাঃ ভেবেছিলাম তোমার কিছু সাহায্য পাবো —

গীতশ্রী এবারে হাসি থামিয়ে বলে — তা' আমার দ্বারা কি হতে পারে তোদের?

— কি না হতে পারে? তোমার বান্ধবীদের মধ্যে থেকে নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে জোগাড় করতে পারো, তালিম দিয়ে তৈরি করতে পারো, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে টিকিট

বিক্রী করতে পারো। এসব ব্যাপারে মেয়েদের সাহায্য না হলে অচল।

গীতশ্রী কি ভেবে বলে — আচ্ছা দেখি তোদের কিছু করতে পারি কিনা। সত্যি কিছু কাজের কাজ যদি করিস, আমার সায় আছে।

অতঃপর দেখা যায় গীতশ্রীকে ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে তালিম দিচ্ছে — গানের, আবৃত্তির। ঘুরে বেড়াচ্ছে সুরেশ লা'হিড়ীব গাড়ীতে এখানে ওখানে।

"বিচিত্রানুষ্ঠানে"র বিচিত্র কাজে একতিল সময় নেই তার!

সুরেশ লাহিড়ী বলে — আপনাকে আমাদের মধ্যে না পেলে যে এ ব্যাপার কী করে ম্যানেজ করে তুলতাম গীতশ্রী দেবী!

গীতশ্রী কষ্টে হাসি চেপে বলে — 'দেবী' 'টেবী' বলে অতো কষ্ট করছেন কেন? বন্ধুর সুবাদে আমাকে বরং 'ছোট মাসী' বলুন না?

সুরেশ লাহিড়ী যেন ভারী আহত হয়। দুঃখিত ভাবে বলে — আপনি যে কেন এমন করেন? আমার মনের ভেতরটা কি আপনি দেখতে পান না?

—ওমা সে কি? পরম বিস্ময়ের ভাণ করে গীতশ্রী — তাই আবার দেখা যায় নাকি? আমার কি দিব্য দৃষ্টি আছে?

— দিব্য দৃষ্টির দরকার হয় না, একটু করুণা দৃষ্টি থাকলেও দেখা যেতো গীতশ্রী দেবী। আপনাকে কি করে বোঝাবো আমার মনের অবস্থা। আমি আপনার জন্য মরতে পারি গীতশ্রী দেবী।

—দোহাই আপনার ও চেষ্টাটা আর করবেননা। মরা টরা, আমার কেমন সহ্য হয়না!

গীতশ্রী এই লোকটার বোকার মতো কথাবার্ত্তা শুনে মনে মনে হাসে বটে তবু কিছু প্রশ্রয় কি দেয়না ?

স্তুতিগানের মোহ, বুদ্ধিসম্পন্ন লোককেও একটু নির্ব্বোধ করে তোলে বৈকি।

তাছাড়া—কাজ কিছু হোক না হোক, "একটা কিছু করছি" মনে করে ব্যস্ত থাকার মধ্যেও কতকটা আত্মতৃপ্তি আছে। তাই গীতশ্রীকে যেখানে সেখানে দেখা যায় সুরেশ লাহিড়ীর সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য সুব্রতও সঙ্গে থাকে অনেক সময়। আর সেইটাই গীতশ্রীর বাড়ীর লোকের কাছে ছাড পত্র।

কিন্তু তবু একদিন ব্যাপারটা আর একটা কারণ দিয়ে চোখে বাজলো যামিনীমোহনের।

বাড়ীতে ধোবা এসেছে।

পর্ব্বত প্রমাণ কাপড় জমা হয়ে রয়েছে এক পাশে। খাতা-পেন্সিল হাতে মেজবৌ।

জ্বলন্ত সিগারেট ধরা হাতটাকে আর একটা হাতের সঙ্গে পিছন দিকে আবদ্ধ করে যামিনীমোহন পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন···হঠাৎ চোখ পড়লো এই দিকে!

ওঃ তাই! তাই ধোবার খরচ মাসে পঞ্চাশ টাকা।

কয়েক সেকেণ্ড চুপকরে দাঁড়িয়ে থেকে ধোবাটাকেই প্রশ্ন করেন—তুমি কি আজকাল মাসে একবার করে আসছো মতিলাল ?

'তুমি' সম্বোধনে ভীত মতিলাল করজোড়ে বলে — আজ্ঞে না কর্ত্তাবাবু, প্রিত্যেক রবিবারে রবিবারে আসি আমি।

—হুঁ! খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে বাঙলা দেশে "ভাত নেই, কাপড় নেই!"···এবাড়ীটা বোধহয় বাঙলা দেশের বাইরে, কি বলো মেজবৌমা ?

মেজবৌমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন—তার আর আমি কি করবো বলুন ? ইচ্ছে হয় হিসেব করে দেখুন আমার ঘরের ক'খানা জিনিশ যাচ্ছে। একা গীতাই তো সাতদিনে সাতসেট্ শাড়ীব্লাউজ বদলায়।……

একটু অপেক্ষা করে শ্লেষের সুরে আবার বলে — অবিশ্যি দরকারও হয়। সর্ব্বদা বাইরের কাজে ঘোরা, বড়লোকের গাড়ীতে যাওয়া-আসা করা —।

যামিনীমোহন প্রশ্ন করেন — হুঁ লক্ষ্য করছি বটে, তিনি আজ-কাল খুব উড়ছেন। … কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

—কি করে জানবো বলুন। আমার অনুমতি নিয়ে তো সবাই চলছে না।

— আচ্ছা এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

ধীরে ধীরে আপনমনে বলেন — নাঃ কর্ত্তব্য এখনো ফুরোয নি। 'আমি মরে গেছি' মনে করে চুপকরে থাকবার দিন আসেনি এখনি।

ওদিকে মেজবৌ গিয়ে আছড়ে পড়েন বিছানায়। জলস্পর্শ করবেন না তিনি আজ।

ডাকতে আসেন সুবলা।

ডাকতে আসেন সন্তোষিণী।

হঠাৎ উঠে বসেন মেজবৌ, শানানো মাজাঘসা গলা বেশ কিছু চড়িয়ে বলেন — মাপ করবেন মা, যে বাড়ীতে দু'খানা শাড়ী ধোবার বাড়ী দিলে বাক্য যন্ত্রণা সইতে হয়, সে বাড়ীতে ভাত খাবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

সন্তোষিণী বধূর হাত ধরে কাতর ভাবে বলেন — কি যে বলো বৌমা! কার বাড়ী, কার ঘর? সংসার তো তোমাদেরই! তোমার শ্বশুরের ভীমরথী হয়েছে তাই অমন করছেন। আর দিনকালও হয়েছে তেমনি। পয়সা কমে গেছে — সবদিকে দৃষ্টি না দিলে চলে না।

মেজবৌ উদাস গম্ভীর স্বরে বলেন — সবদিকে দৃষ্টি দিলে তো বলবার কিছু ছিলোনা মা। বাজারের সেরা সব থেকে দামী সিগারেটটি তো দেখছি টিন টিন উড়ে যাচ্ছে। তাতে বুঝি খরচ নেই? অবিশ্যি ওঁর টাকা, ওঁর দাবী আছে। সবদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথাটা তুললেন, তাই বলা!

বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে থাকেন সন্তোষিণী!

কী শুনলেন তিনি? সত্যি শুনলেন তো? নাকি স্বপ্ন?

বজ্রাহত আর একজনও হয়ে পড়েছেন বটে। কারুর কান বাঁচিয়ে কথা বলবার ইচ্ছে তো ছিলোনা মেজবৌয়ের। যামিনীমোহনের কানেও গেছে। বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে থাকতে থাকতে কথাটা এসে পড়েছে কানের ওপর।......

হাত থেকে স্খলিত হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বাজারের সেরা দামী সিগারেটের টিনটা।.........মাথাটা কেমন ঝুঁকে পড়ে।...

নীচের উঠোনে গোবিন্দ সাবান আর লিলিকে নিয়ে পড়েছে।

মনে তার স্ফূর্ত্তির জোয়ার, কণ্ঠে বেসুরো গান। লিলিকে আদর করছে আর তার গায়ে সাবান ঘসছে।

রুণু সামনে উবু হয়ে বসে আছে গোবিন্দকাকে সাহায্য করবার মানসে। তার কাছে বালতী ও মগ।

হঠাৎ গীতার উদ্ধত উত্তেজিত কণ্ঠ কানে আসে — বাড়ীর কর্ত্তা

বলেই কি যাকে যা খুসি বলবার রাইট জন্মায়? বোরকা পরে পর্দার আড়ালে থাকবার দিন এখনো আছে তোমরা মনে করো? দেখে এসো দিকি বাইরে, কি ভাবে চলাফেরা করছে মেয়েরা! যুগের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় মা, ইচ্ছেমতন শাসন করার চেষ্টা বোকামী ছাড়া কিছু নয়।......আমি কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি — বাবার কোনো রাইট নেই যাকে যা খুসি শাসন করবার।

শেষ কথাটা ভালোকরে কানে আসে গোবিন্দর।

সে সাবানের ফেনা মাখা হাতে উঠে আসে। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে — কী বললি গীতা? মামার কোনো রাইট নেই তোদের শাসন করবার? কলেজে পড়ে বড্ডো যে বড়োবড়ো কথা কইতে শিখেছিস। এদিকে তো মুখে চোখে রং মেখে ডলিপুতুলটি হয়ে বসে আছিস।

গীতশ্রী উত্তেজিত ভাবে বলে — দেখো মা, ওকে বারণ করে দাও, ওযেন আমার বিষয়ে কোনো কথা কইতে না আসে।

সন্তোষিণী ক্লান্তস্বরে বলেন — তুই সব কথায় কথা কইতে আসিস কেন গোবিন্দ? নিজের চরকায় তেল দিগে না।

গোবিন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয় — নিজের চরকা পরের চরকা বুঝিনা মামী, হক্ কথা আমি কইবোই। দু'খানা পাশ দিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়েছে মেয়ের! মামার ওপর কথা।...এই আমি বলে দিচ্ছি — বাড়ীর কর্তা যাকে যা খুসি বলতে পারে, বলবার রাইট আছে।

লিলির 'ঘো ঘো' আহ্বানে বাকী কথা মূলতুবী রেখেই চলে যেতে হয় গোবিন্দকে।

গীতশ্রী একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চলে যায়।

ছয়

যথাসময়ে—

গীতশ্রীদের অনুষ্ঠান শেষ হয়! রীতিমত সাফল্যের সঙ্গেই হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা সুরেশ লাহিড়ী পরিচালিকা গীতশ্রী দেবীর হাত চেপে ধরে বলে ওঠেন — এর সমস্ত সাফল্যের জন্য দায়ী আপনিই গীতশ্রী দেবী। আপনার সাহায্য না পেলে — ইয়ে আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি যে আপনাকে কি রকম—

গীতশ্রী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—কতো টাকা উঠলো আপনার?

— আশাতিরিক্ত! বুঝলেন গীতশ্রী দেবী, এর অর্দ্ধেকও আশা করিনি আমি। আচ্ছা দাঁড়ান আমাদের কেশিয়ার সুব্রতবাবুকে ডাকি। নীট্ খবর পাবেন তাঁর কাছে।

—সুব্রতবাবু! সুব্রতবাবু!

কিন্তু কোথায় সুব্রতবাবু? অভিনয়ের গোলমালের সুযোগে কেশিয়ার সুব্রতবাবু নিখোঁজ। অবশ্য ক্যাশটা সঙ্গে নিতে ভোলেন নি।

একটা গোলমাল হৈ-চৈ পড়ে যায়।

যথেচ্ছ গালাগালি ছোটায় সুরেশ লাহিড়ী। ---গীতাকেও দু'একটা কথা বলতে ছাড়ে না। বেশ অপমানসূচকভাবেই বলে — মাসী বোন-পোর ষড়যন্ত্র আছে এই তার ধারণা।

অপমানিতা গীতা এক সময় চলে আসে।

না লাহিড়ীর গাড়ীতে নয়, পায়ে হেঁটে। ··· বাড়ীতে কাউকে কিছু বলে না, শুয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে খোঁজ পড়ে। ঘুম থেকে উঠে পর্য্যন্ত সুব্রতকে দেখা যাচ্ছে না।

সকলের মুখে মুখে ঘোরে সুব্রত কই? সুব্রত? ... তিনতলা থেকে একতলা ... সকাল থেকে দুপুর ... সবাই খোঁজে—সুব্রত?

গীতা নীরব।

মুরলা ডাক ছেড়ে কাঁদে।

সন্তোষিণী মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও কাঁদতে থাকেন।

কি হলো ছেলের? নিরুদ্দেশ? আত্মঘাতী? না অপঘাত? মামারা বলে— গেছে কোথাও বন্ধুদেব পাল্লায় পড়ে। খুব তো লায়েক হয়েছে আজকাল।

শুধু যামিনীমোহন বসে থাকেন পাথবেব মত, কোন মন্তব্য করেন না।

সমস্যার মীমাংসা হয় সন্ধ্যায়।

সুরেশ লাহিড়ী 'তক্কে তক্কে' সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীতে এসেছে খোঁজ করতে। আসামী সারা দিন যেখানে হোক ঘুবে বেডাক, এসময় নিশ্চয় বাড়ী ঢুকেছে।

অসভ্য ইতরের মতো চেঁচায় সে—বেরিয়ে আসুন সুব্রতবাবু. ভালোয় ভালোয় টাকা ফেলে দিন তো মঙ্গল, নইলে পুলিশ কেস্ কবে ছাড়বো আমি। সুরেশ লাহিডীব টাকা মেরে পার পাবে এতো বডো ধুরন্ধব জগতে জন্মায়নি এখনো।···ওঃ দেখছি বাড়ীর লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আছে। মনে রাখবেন কেস্ করে সবাইকে কোর্টে দাঁড করাতে পারি। ···ওঃ বাড়ীর দরজায় খুব যে লম্বা চওড়া খেতাব লটকানো হয়েছে, ওহে রায় বাহাদুর নেবে আসুন না একবার।···

জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে বৌরা, ঠাকুর চাকররা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে তামাসা দেখার আশায়। সন্তোষিণী কাঁপেন, মুরলা হাপুস্নয়নে কাঁদে।

আর ওপরে বারান্দায় পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন যামিনীমোহন।

হঠাৎ সকলকে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়ে খোলা রাস্তায় নেমে আসে গীতশ্রী।

গাড়ীর কাছে গিয়ে সুরেশের হাতের ওপর একখানা হাত রাখে। স্থির অচঞ্চল স্বরে বলে—তুমি তো আমাকে খুব ভালোবাসো, আমার জন্যে মরতে পারো বাঁচতে পারো, আমার কথায় এই সামান্য ক'টা টাকার মায়া ত্যাগ করতে পারোনা? চলে যেতে পারোনা নিঃশব্দে?

সুরেশ লাহিড়ী অনায়াসে নিজের হাতখানা সরিয়ে নেয়, তার বড়ো আকাঙ্খিত দুর্লভ হাত খানির স্পর্শ হতে। একটু কুটিল হাসি হেসে বলে—দু'চার হাজার টাকাকে 'সামান্য' বলে উড়িয়ে দিতে পারি এতো বড়োলোক আমি নই গীতশ্রী দেবী। টাকা কি খোলামকুচি? লাভের টাকা চুলোয় যাক, ঘরথেকে আমার নিজের যা গেছে, সেটা দিচ্ছে কে? নগদ দু'টি হাজার টাকা এইতে ফেলেছি আমি, তা জানেন? সুব্রত মজুমদারকে শ্রীঘর বাস না করাই তো আমি সুরেশ লাহিড়ী নই।

গাড়ীর ধুলো উড়িয়ে চলে যায় স্বনামধন্য সুরেশ লাহিড়ী।

রক্তহীন পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থাকে গীতশ্রী। এই পাংশু মুখখানা নিয়ে যে মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজতে বাড়ীর মধ্যে ফিরে যাওয়া দরকার সে জ্ঞানও যেন হারিয়ে গেছে তার। যেন পৃথিবীকে ও সহসা

এইমাত্র চিনলো, সামলাতে পারছে না সেই নতুন অভিজ্ঞতার ভার। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাই।

দিন দুই পরে ওপাড়া থেকে আসে বাড়ীর পুরণো আমলের বাতিল হয়ে যাওয়া স্যাকরা নিত্যানন্দ।

হালফ্যাসানের গহনা গড়াবার কাজের উপযুক্ত স্যাকরা নিত্যানন্দ নয়, তাই ইদানীং বাতিল করা হয়েছে তাকে। বৌদের মনের মতো গহনার জন্যে অর্ডার যায় নামকরা জুয়েলারির দোকানে।

নিত্যানন্দ কর্তার কাছে গিয়ে বলে — কর্তা বাবু, এই জিনিশ ক'টা বাঁধা রেখে আপনার নাতি কিছু টাকা নিয়ে রেখেছেন, শুনছি তিনি নাকি — হয়ে তাঁকে নাকি — মানে এগুলোর কি বিহিত হবে বলুন কর্তা মশাই ?

— অর্থাৎ সুব্রতর কীর্ত্তিকলাপ কানে পৌঁছেছে তার।

তাই ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে চোরাই মাল রাখবার দায়ে পড়বার ভয়ে।

পাতলা কাগজের মোড়ক থেকে জিনিষ 'কটা তুলে তুলে দেখেন যামিনীমোহন।...

গীতার গলার পেনডেন্ট আর কানপাশা। যার জন্যে চাকর বাকরদের চালপড়া খাওয়ানোর তোড়জোড় চলেছিলো একদিন।

আরো যোগ হয়েছে দুটো জিনিশ।

সন্তোষিণীর হাতের পাথর বসানো আঙটিটা, আর যামিনীমোহনের হাতঘড়ি।

যামিনীমোহন জানা জিনিষ দেখার মতোই নিতান্ত অবহেলা ভরে জিনিষ ক'টা দেখে সহজভাবে বলেন — নাতি নিজে নয় হে নিত্যানন্দ, হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়ায় আমিই ওক'টা বন্ধক

দিতে পাঠিয়েছিলাম, মনে পড়েছে।··· যাকগে — ও তুমি বেচেই নাওগে, সেকেলে হয়ে গেছে জিনিষগুলো। তুমি বরং তোমাদের গিন্নীমার আঙুলের আন্দাজে তু'চারটে আঙটি এনে দেখিওতো। নতুন ডিজাইনের রাখছো টাকছো কিছু ?

— আজ্ঞে কর্ত্তা, রাখছি বৈকি। আনবো, কাল পশুরই আনবো। কিন্তু ঘড়িটা কর্ত্তা মশাই ?

—ঘড়ি ?

যামিনীমোহন হেসে ওঠেন — ও ঘড়ি তুমি ফেলে দাওগে নিত্যানন্দ, ওর আর কোনো পদার্থ নেই। বায় বাড়ীর মতোই অবস্থা হ'য়ে গেছে ওর। চিরদিনের মতো দম বন্ধ হয়ে গেছে, চালাতে গেলে চলেনা, জোর করলে স্প্রীং কেটে যায়।

নিত্যানন্দ উঠে যেতে সন্তোষিণী রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন—এই দুঃসময়ে আবার আমার আঙটির ফরমাস কেন ? বুদ্ধিভ্রংশ হলো নাকি তোমার ?

যামিনীমোহন হেসে ওঠেন। হাসিটা যেন কেমন বাড়াবাড়ি।

হেসে বলেন—নাঃ বুদ্ধিটা আর ভ্রংশ হচ্ছে কই ? হলে তো বেঁচে যেতাম, আনন্দে থাকতাম। দুঃসময় বলেই তো গহনার ফরমাস দেওয়া দরকার। মাছ ঢাকতে শাক চাই না ? আগুণ ঢাকতে ছাই ?

আরাম কেদারাখানাই যেন এখন একমাত্র আশ্রয়।

যেন সমস্ত সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে এইটুকুর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে পেরে বেঁচেছেন যামিনীমোহন। চুপচাপ বসে থাকেন তিনি মাথাটা ঝুঁকিয়ে, সন্তোষিণী বারান্দার রেলিঙে পিঠ দিয়ে বসে থাকেন।

জীবনে কখনো স্বামীকে ভয় করেননি সন্তোষিণী আজকাল কেমন যেন ভয় ভয় করে

কাছে বসে থাকেন কথা জোগায় না মুখে।

কোনো কিছুর বালাই যার মনে নেই সে আসে লাফাতে লাফাতে।

—এই যে মামা, মামী দুজনেই আছো। সুব্রত বাবুকে দেখলাম যে ওপাড়ায়।

সন্তোষিণী চমকে তাকান।

—কোথায় দেখলি রে গোবিন্দ ?

মাণিকতলার ওদিকে। আমি চলেছি নিজের ধান্ধায়···হঠাৎ দেখি অথন্তে এক রেষ্টুরেণ্টে বসে, বাবু আমাদের চটা ওঠা এক এনামেলের কাপে চা গিলছেন। আমাকে দেখে ভযে কাঠ! তখন 'গোবিন্দ মামা' 'গোবিন্দ মামা'র ঘটা দেখে কে।···বলে—'প্রকাশ করে দিওনা।'··· বাড়ীতে সবাই ওর জন্মে ভেবে খুন হয়ে যাচ্ছে, আর আমি খবরটা 'গেপে' বসে থাকবো! শোনো দিকি কথা। বড়দিকে বলে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসেছি।

সন্তোষিণী প্রশ্ন করেন—তুই ওখানে গিয়েছিলি কিসের ধান্ধায় ?

—এ্যাই—আসল কথাটাই ভুল!

হঠাৎ টিপ্ টিপ্ করে দুজনকে দুটো প্রণাম করে বসে গোবিন্দ।

—এ আবার কি ? কি হলো ? জিগ্যেস করেন সন্তোষিণী!

যামিনীমোহন কিছু বলেন না, শুধু পিঠটা খাড়া করে সোজা হয়ে বসেন।

—একটা চাকরী পেয়ে গেলাম। উঃ বাঁচা গেলো বাবা, বাক্যযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো।

সন্তোষিণী অশ্রুসিক্ত চোখ নিয়েই হেসে ফেলে প্রশ্ন করেন—চাকরীর জন্যে কে তোকে বাক্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল রে গোবিন্দ?

—কেন, ওই তোমার সাধের গঙ্গাজলের কন্যে! তোমাদের আদরের নতুন বৌমা! রোজদিন ঘ্যানঘ্যানানি—'চাকরী খোঁজো, চাকরী খোঁজো, কতোদিন আর মামার গলগ্রহ হয়ে থাকবে—বয়েস হয়েছে—এখন মামাবাবুর সাহায্য করা উচিৎ।'—এই সব বাক্‌চাতুরী!...আরে বাবু, করা উচিৎ তাকি আমিই জানিনা? কিন্তু চাকরী নিয়ে কে বসে আছে আমার জন্যে? বলে কতো বি এ, এম এ, পাশ করারাই ভ্যারেণ্ডা ভাজছে।...যাক্ জুটিয়েছি তো একটা? আর ট্যাঁ ফোঁ করতে আসুক দিকি?

এতোক্ষণে যামিনীমোহন প্রশ্ন করেন—কাজটা কি?

গোবিন্দর বুদ্ধির ওপর আস্থার লেশও নেই তাঁর। অবোধ বৈ আর কিছু নয়, কে জানে কে ওর সঙ্গে পরিহাস করেছে। নাকি ঠকবার তালেই আছে কেউ।

গোবিন্দ মহোৎসাহে উত্তর দেয়—কাজ আর কি, কারখানার কাজ! আমাদের আখড়ার একটা ছেলে, বলে দিলো—চলে গেলাম 'দুগ্‌গা' বলে। ব্যস হয়ে গেলো চাকরী। হবেনা? চেহারা খানি তৈরি করেছি কেমন? সাহেব তো দেখে মহাখুসি।

—কোথাকার কারখানা?

আর একটি প্রশ্ন করেন যামিনীমোহন।

—ইয়ে — কাশীপুরের। যা বুঝছি বাড়ী থেকে আসা যাওয়া চলবে না, ওখানেই থাকতে হবে। সে যা হয় হয়ে যাবে মামী ভেবো না। কালই জয়েন করতে হবে।...কাজেই আজ রাত্রেই —

সন্তোষিণী শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন — কাশীপুরের কারখানার কাজ, সে তো লোহাপিটোনোর কাজ !

— তবে ? হা হা করে হেসে ওঠে গোবিন্দ — লোহা পিটোবোনা তো কি ফ্যানের তলায় গদিআঁটা চেয়ারে বসে খস খস করে কলম ঘসবো ? কতো বিদ্বান ভাগ্নেটি তোমার।

— কতো মাইনে ?

— মাইনে মাইনে ? আবার কি ? 'হপ্তার মজুরি'। হপ্তায়— সাড়ে — সাড়ে ইয়ে কি যে বললো অতো কি কান করেছি ?

কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক তাকায় গোবিন্দ। তারপর উঠে পড়ে ঘরে গিয়ে দেখতে থাকে টেবিলে, সেলফে, আলমারীর মাথায়।···হতাশ হয়ে ঘুরে এসে বলে — মামার টিনটা কোথায় মামী ? সিগারেটের টিনটা ?

সন্তোষিণী ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।

— ও আর উনি খাননা বাবা।

— অ্যাঁ। কি বললে ? মামা সিগারেট খাননা ? তার মানে ? বেড়ালের মাছে অরুচি। মামা, ব্যাপার কি বলো তো ?

যামিনীমোহন মৃদুহাস্যে বলেন — কি হবে, মিথ্যে খরচ পুষে ?

— মিথ্যে খরচ ?

অকস্মাৎ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গোবিন্দ চেঁচিয়ে ওঠে — মামী, নিশ্চয় তুমি কিছু বলেছো ! সব পারো তুমি। কি বলেছো মামাকে ?

সন্তোষিণী ম্লান হাসি হেসে বলেন — আমি আর কতোই বলতে পারবো ? বাড়ীতে বলবার লোকের কি অভাব আছে রে গোবিন্দ ?

হঠাৎ কোঁচার খুঁটে চোখ ঢেকে মেয়ে মানুষের মতো প্রায় ডুকরে কেঁদে ছুটে পালিয়ে যায় গোবিন্দ। আর্ত্তনাদের মতো শোনায় তার

কণ্ঠস্বর — কেন ?…কেন ?…মামাকে তোমরা — সইবোনা, এ সব সইবোনা আমি।…প্রথম হপ্তার মজুরি পেলেই আমি — সব টাকা গুলো দিয়ে —

বিচলিত যামিনীমোহন হাত বাড়িয়ে বলেন — খাতা দুখানা দাওতো গিন্নী, জমাখরচটা আজ একবার ভালো করে মিলিয়ে দেখি। গোবিন্দকে বসিয়ে ছিলাম কোন হিসেবের ঘরে ? বাজেখরচের ? সাতাশ বছর ধরে ওর জন্যে কতো বাজে খরচ হয়েছে তারই হিসেব কষেছি যে বসে বসে !

কিন্তু গোবিন্দর হিসেব মিলোতে গিয়েই কি এতো বেশী শক্ লেগেছিলো যামিনীমোহনের ? তাই গোবিন্দকে বিদায় দিয়ে…… চুপচাপ খাতার ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসেই থাকলেন তিনি ?

ছেলেরা যখন ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলো, তখন প্রাণটার এতোটুকু যদি বা কোথাও অবশিষ্ট ছিলো, জ্ঞানটা গিয়েছিলো উধাও হয়ে।

এতোদিন কি চিশ্চিন্ত হলেন যামিনীমোহন ?

পেলেন — বুদ্ধিভ্রংশ হতে পারার নিশ্চিন্ত আরাম ?

নাঃ, একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন যামিনীমোহন।

গোলমালের মধ্যে সন্তোষিণী কাতর হাহাকার করে ওঠেন — ওরে গোবিন্দটা কোথায় রইলো, তা'কে একটা খবর দে তোরা !… সে যে মামা বলে প্রাণটা উপড়ে দিতে পারতো।…তাকে আমি মুখ দেখাবো কি করে ?

গোবিন্দ সম্বন্ধে এতোটা বাড়াবাড়ি ছেলেদের বোধ হয় পছন্দ

হয় না, ভ্রু কুঁচকে সরে যায়। বৌরা বলে — সে আছে কোথায় সে ঠিকানা কে জানে? গৌরী জানে তো বলুক।…তাই বা ছুটে গিয়ে তাকে ডেকে আনবার সময় কার হচ্ছে? তবে যদি গোবিন্দ না এলে শেষ কাজ বন্ধ রাখতে হয়, বুঝুন তাঁর ছেলেরা।

সন্তোষিণী চুপ হয়ে যান।

ওদিকে গোবিন্দ আছে নিজের তালে।

সে আপন মনে বেসুরো গান গায়, মজুরের কাজ করে আর হিসেব করে সপ্তাহান্তিক মজুরিটা পাবে কবে।

আকাঙ্ক্ষিত দিন আসে।

পাড়ার কাছাকাছি 'বাস্' থেকে নেমেই প্রথম যে দোকানটা দেখে তা'তে ঢুকে পড়ে বেছে বেছে দেখেশুনে কেনে দু' টিন সিগারেট।

ভাবতে ভাবতে যায় ···টিন দুটো আরাম কেদারার হাতলে বসিয়ে দিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে নেবে মামাকে।

মামার প্রসন্ন দৃষ্টির অন্তরালে ফুটে উঠবে একটি সস্নেহ হাসি। গোবিন্দর সকল সাধনার পুরস্কার।

বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই কেমন নিঃঝুম লাগে।

দোরের কাছে লিলিটা মনমরা হয়ে বসে আছে কুণ্ডলী হয়ে। ওকে টপ করে তুলে নিয়ে গোবিন্দ সোহাগভরে প্রশ্ন করে—কি গো 'লিলিরাণী' মুখ এমন বেজার কেন? অভিমানে? ···আরে বাবা তোকে খুব মনে ছিলো আমার কি—করবো — পরের চাকরী। ··· পরক্ষণেই ওকে লুফতে লুফতে চেঁচায়—কই গো মামী, কোথায় সব? সন্ধ্যেরাতেই বাড়ীতে নিঃঝুমের পালা কেন? ···এই রুণু, এই বেবু, কি হলো তোদের?

কেউ সাড়া দেয় না।

ধক্ ধক্ করে ওঠে বুকটা। ···রোলার তোলা বুক।

শুকনো শুকনো মুখে উঠে যায় দোতালায়। কাউকে দেখতে পায় না ধারে কাছে। ···বারান্দায় গিয়ে দেখে আরাম চেয়ারটা পড়ে আছে, যেন অন্তহীন শূন্যতা নিয়ে।

কাঁপতে থাকে পা। ·· পর্দ্দা ঠেলতে হাত কাঁপে· ।

বোধহীন গোবিন্দর এ এক অদ্ভুত নতুন অনুভূতি।

তবু সাহস করে পর্দ্দাটা ঠেলে ঢুকে পড়ে ঘরে।

বিছানা শূন্য।

তা'তে কি। কোনদিন কি সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বার হন না যামিনীমোহন? হয়তো তাই।

নাঃ তা নয়।

দেওয়ালেব একপাশে বাসিশাকের মতো বিশীর্ণ মূর্ত্তিতে গুটিয়ে শুয়ে আছেন সন্তোষিণী। ···নিরাভরণা শুভ্রবাসা।

শুভ্রতাটা কী নির্লজ্জ রূঢ়।

মামীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে মেয়েমানুষের মত ডুকরে কেঁদে ওঠে গোবিন্দ—ও মামী, আমার মামাকে তোমরা কোথায় ফেললে গো। ওগো আমি যে পাঁচদিনের জন্যে মোটে বাড়ী ছাড়া ছিলাম, এর মধ্যে এতবড়ো কাণ্ড কি করে হলো গো—

ঠাঁই ঠাঁই করে নিজের মাথাটা মাটিতে ঠোকে গোবিন্দ।

চীৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে নির্ম্মল এসে দাঁড়ায়।

কয়েক সেকেণ্ড দেখে—'মুইসেন্স' বলে চলে যায়।

পর্দ্দার আড়ালে ছোট বড়ো অনেকগুলি পা দেখা যায় কিন্তু ঘরের মধ্যে পড়ে না সে পায়ের ধূলো।

গোবিন্দর কান্নাটা সত্যিই হাস্যোদ্রেক করে, তাই কেউ গ্রাহ্য করে ঢোকে না, বাইরে থেকে মজা দেখে।

এক সময় সন্তোষিণী উঠে বসে বলেন—গোবিন্দ চুপ কর।

ছোটছেলের মতো সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে যায় গোবিন্দ। কিছুক্ষণ বসে থাকে জড়ের মতো। ...ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় চারিদিকে।

এক সময় আস্তে আস্তে উঠে পকেট থেকে বার করে সিগারেটের টিন দু'টি। সাবধানে পাশাপাশি রেখে দেয় ,বিছানার ওপর।

নতজানু হয়ে খাটের ধারে বসে বিছানায় মাথা ঠেকায়।

দালানে—

থানপরা রুক্ষকেশ তিনভাই। তর্কের ঝড় উঠেছে উদ্দাম হয়ে। দূরে বসে আছেন সন্তোষিণী দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে! ...ওদিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে বসে দুই বৌ। ...বড়বৌয়ের গায়ের কাছে বসে তাঁর মা, মেজবৌয়ের কাছাকাছি তাঁর বাবা। ...মাঝখানে কম্বলের আসন পেতে বসে কুলপুরোহিত।

আগের কথার জের টেনে সুবিমল বলে—পারলে অবশ্য করাই উচিত। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে সমারোহ করার বিধি রয়েছে যখন, কিন্তু না থাকলে তো চুরি করতে পারি না।

বড়বৌয়ের মা বলেন — সেতো সত্যিই বাবা! তুমি তো আমার তেমন ছেলে নও। কিন্তু এখন বাপের 'ছেরাদ্দয়' সর্বস্ব বিকিয়ে ফেললে এরপর যে কন্যেদায়ের সময় পরের কাছে হাত পাততে হবে! নইলে উচিৎ তো বটেই —

পরিমল উদ্ধতভাবে বলে—উচিৎ বলেই উচিৎ। ওসব বামুনদের

কারসাজি! আমার মতে টাকা থাকলেও কতকগুলো ভূতভোজন করিয়ে, আর বামুনের পেট ভরিয়ে সে টাকা খরচ করা উচিৎ নয়। আমি তো করবো না।

মেজবৌয়ের বাবা বলেন—ঠিক কথা। আমিও একথা সমর্থন করি। তাছাড়া — তোমাদের স্বর্গত বাবা, নিজে যথেচ্ছ খরচ করে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন, এক পয়সা রেখে যান নি ছেলেদের জন্যে। তোমাদের কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই তাঁর শ্রাদ্ধে দানসাগর বৃষোৎসর্গ করবার। এতে যদি বেহাই মশায়ের প্রেতাত্মা অসন্তুষ্ট হ'ন, নাচার।...

নির্ম্মল ব্যঙ্গহাসির সঙ্গে বলে — আপনাদের কি ধারণা, আত্মা বলে সত্যিই যদি কিছু থাকে, সে ওই চালকলার পিণ্ডি খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়? যতো সব কুসংস্কার! মৃতলোকের আত্মীয়স্বজনের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে, এসব পুরুত বামুনদের ব্যবসা চালানো।

— দুর্গা দুর্গা! উঠে দাঁড়ান কুলপুরোহিত ভটচায মশাই। ... বলেন—থাক বাবা থাক। পিতৃশ্রাদ্ধে ঘটা করবার আইন কিছু নেই। শুদ্ধ হবার জন্যে যেটুকু আইন আছে যদি মানো তো—ওই দিন একটু তিল কাঞ্চনের ব্যবস্থা রেখো। তারা ব্রহ্মময়ী মা। ..

একটুক্ষণ পরেই বোধ করি ভটচায মশাইয়ের কাছে খবর পেয়ে ছুটে আসে গোবিন্দ তার মানে? মামার 'ছেরাদ্দয়' ঘটা হবে না মানে?

সন্তোষিণী এতোক্ষণ পরে মুখ তুলে বলেন—তুই যা গোবিন্দ।

— যাবো মানে? এর একটা হেস্তনেস্ত না করে যাবো? মামার ছেরাদ্দয় 'বৃষ' করা চাই — কাঙালীভোজন করানো চাই ব্যস। রায়বাহাদুর যামিনীমোহনের ছেরাদ্দ হবে তিল-কাঞ্চনে। একথা

মুখে আনতে লজ্জা করে না। তোমরা সব ইজের জামা পড়ে আপিস যাও না? গলায় দড়ি গলায় দড়ি।

পরিমলের শ্বশুর বলেন — এই কিম্ভুত জীবটি কে হে পরিমল।

— আর কেন বলেন? বাবার সব কুপুষ্যি। বেরিয়ে যা গোবিন্দ। উঃ চাবুক লাগালে রাগ যায় না।

বড়বৌয়ের মা বলেন — তা' এবারে ওসব কুপুষ্যিগুলো বিদায় দাও বাবা সুবিমল। তোমাদের তো আর সত্যি জমিদারী নেই। ...ওই বৌটা বুঝি ওবই? বাবাঃ, আজকালকার দিনে দুটো দুটো মানুষ পোষা।

পরিমলের শ্বশুর বলেন — বেহাই মশাই আমাদের উদার ব্যক্তি ছিলেন।

অকস্মাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হয় গোবিন্দ।

তেড়ে এসে বলে — খবরদার বলছি, মামার কথা মুখে আনবে না। ...কুটুম আছো কুটুমের মতো থাক, বেহাইয়ের ছেরাদ্দর সন্দেশ মণ্ডা খেয়ে যাও। এ বাড়ীর কথায় কুপরামর্শ দিতে আসা তো বরাতে দুঃখ আছে।

সুবিমল তেড়ে ওঠে। নির্ম্মল ওর ঘাডটা চেপে ধরে।

সন্তোষিণী আর একবার মুখ তুলে আদেশের দৃঢস্বরে বলেন— গোবিন্দ যা তুই এখান থেকে। —

মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায় গোবিন্দ।

বড়বৌয়ের মা বলেন—এই অবসরে বাবা, তোমরা তিন মাথায় এক করে বাড়ীঘরের একটা বিলি বন্দেজ করে ফেলো। ও এই বেলাই হয়ে যাওয়া সুবিধে। ...দোতালায় বেহাই মশাইয়ের অংশটা দরুণ

থাক আমার সুবিমলের। শাস্ত্রেই রয়েছে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ। সুবিমলের পুরণো ঘর দু'খানায় ওর ছেলেরা পড়াশুনা করবে, আত্মীয় কুটুম এলে থাকবে এই আর কি।... বেয়ান ঠাকরুণ তাঁর বিধবা আর আইবুড়ো দুই মেয়ে নিয়ে নীচের তলায় কোথাও থাকুন। ভাগ্নেটি এবার পথ দেখুক। আর কেন।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেজবৌ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন— আমি কিন্তু বরাবর যেমন তিনতলায় আছি, থাকবো। ওর দখল ছাড়বো না। ...অবিশ্যি আমিও নীচের দিকে পা বাড়াতে যাবো না। কুকারে রাঁধবো, ষ্টোভে চা খাবো, বাস। কারুর ঝামেলা নিতেও চাই না। কাউকে ঝামেলা দিতেও চাই না।

বড়বৌ খর খর করে বলে ফেলেন — আর আমার গলায় শাশুড়ী-ননদ, অপুষ্যি কুপুষ্যি সব, কেমন? ভাগটা মন্দ নয়!

মেজবৌ কুটিল হাসি হেসে বলেন — তা' দিদি, শুনলে তো এখুনি, জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠভাগ! পাওনার বেলায় জ্যেষ্ঠ হতে গেলে দায়িত্বের বেলাতেও হতে হয় বৈকি।

ঠিকরে ওঠেন বড়বৌয়ের মা।

—মেজমেয়ের কথাগুলোতো আচ্ছা চ্যাটাং চ্যাটাং।

এক সময় সন্তোষিণী উঠে যান। ধীরে ধীরে উঠে যান। গিয়ে ঢোকেন গোবিন্দর ঘরে।

দেখেন গোবিন্দ যামিনীমোহনের বড়ো ফটোখানা ওপরের ঘর থেকে নামিয়ে এনে ধুলো মুছছে।

এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত স্থিরভাবে বলেন — গোবিন্দ, তোর চাকরীটার কি হলো।

গোবিন্দ বিক্ষুব্ধ স্বরে বলে—ও অপয়া চাকরী আবার !

সন্তোষিণী জেদের মতো বলেন — তা বললে তো হবে না বাবা, তুই এবারে গৌরীকে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে থাক গে যা।

গোবিন্দ অবাক বিস্ময়ে বলে- নতুন বৌকে নিয়ে। সে আবার কি ? কোথায় যাবো ?

— যেখানে হোক। বেটাছেলে, এতো গায়ের জোরের বড়াই করিস, এটুকু মনের জোর নেই। নিজের বৌটার ভার নিয়ে, ছুটো পেট চালাতে পারবি না ? আমার হুকুম তুই এ বাড়ী থেকে চলে যা।

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলে — তা' তোমার যদি হুকুম হয় যেতেই হবে !

—হ্যাঁ বাবা, তাই হুকুম। আজ পারিস আজই চলে যা। খোলার চালা, টিনের চালা — যেখানে এতোটুকু আশ্রয় পাবি।

পাছে অপরের কাছে অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হতে হয় গোবিন্দকে, সেই আতঙ্কে এমন নিষ্ঠুর বাক্যও উচ্চারণ করে বসেন সন্তোষিণী।

গোবিন্দ বলে — বেশ। তা' মামার 'ছেরাদ্দ'টা বাদে গেলে হতো না ?

সন্তোষিণী ব্যাকুল আবেদন জানান — নারে গোবিন্দ তার আগেই যেতে হবে তোকে। দু' বছরের ছেলে থেকে মানুষ করেছি তোকে 'মা' বলেই জানিস তুই আমায়। তখনো কিছু চাইনি তোর কাছে। আজ তোর হাত ধরে বলছি বাবা, এ বাড়ীর মায়া তুই কাটা।

নির্ব্বোধের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গোবিন্দ।

ধীরে ধীরে প্রায় স্বগত বলে — মায়া কাটাবো? তা' বেশ!

যেন সন্তোষিণীর আদেশ পালন না করে উপায় নেই তার, তাই এমন অসম্ভব প্রতিজ্ঞাপত্রেও সই করতে হচ্ছে তাকে।

ক'দিন পরে দেখা যায় তুমুল সোরগোল তুলে বাড়ী ছাড়বার গোছগাছ করছে গোবিন্দ। ··বিছানা বাঁধছে ট্রাঙ্ক টানাটানি করছে।

অকারণ ছোট ছেলেমেয়েদের তাড়া দিচ্ছে — সব, সব কাজের সময় গোল করিস নি। ·· তবলায় হাত দিচ্ছিস যে। বাখ, বেখে দে। ···

— লিলি কোথায় গেল? লিলি? ···উঃ আজ আর গোলমালে লিলিকে চান করানোই হলো না। ···যাক বাবা ওবাড়ীতে গিয়ে করালেই হবে। ·· কোনো গোলমাল তো নেই সেখানে, নির্ঝঞ্ঝাট।

গৌরী চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রণাম করে ঠাকুর ঘরে, প্রণাম করে সমস্ত গুরুজনকে। ···

অকস্মাৎ গোবিন্দ বলে ওঠে — ধন্যি বাড়ী বটে। বাড়ীর একটা জলজ্যান্ত আস্ত লোক বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে, তা' চোখে এক ফোটা জল নেই কারুর। হুঁঃ। হবে কি? গোবিন্দ তো কোন ছার, বাড়ীর কর্ত্তা চলে গেলো, তাই বড়ো —

বোধ করি অন্যের চোখের জলের ত্রুটি পূরণ সে নিজেই করে, তাই সেখানে আর দাঁড়ায় না। চট করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে।

বেরোবার সময় খপ করে ধরে নির্ম্মল।

বলে— লিলিকে নিয়ে যাচ্ছিস মানে?

— নিয়ে যাবো না মানে? ···গোবিন্দ রুখে ওঠে — তোমাদের

হাতে পড়ে হত্যে হতে রেখে যাবো ওকে। কে ওর সেবা-যত্ন চাঁল্যাবে শুনি?

—সে আমরা বুঝবো! বাবার কুকুরটা খামোকা তুমি নিয়ে যাবে কেন?

আর এই বাজনা দুটোই বা যাচ্ছে কি জন্যে?…বেশ আছো? যাবার সময় যা কিছু হাতিয়ে নিতে পারা যায়, কেমন?…বাড়ীর জিনিশ বাড়ীতে থাক।

নির্ম্মল ডুগী তবলা দুটো নামিয়ে রাখে, গোবিন্দর ট্রাঙ্কের ওপর থেকে।

গোবিন্দ হতভম্ব হয়ে বলে—মামী, দেখছো? দেখছো ছিংসুটে-পানা? ডুগী তবলা দুটো নিয়ে চলবেনা।…রেখে তোরা কি করবি শুনি? একটা চাঁটি দিতে শিখেছিস কেউ?

—না শিখেছি, শিখিনি। চেলিয়ে উনুনে দেবো তাও ভাল।

—চেলিয়ে উনুনে দিবি? বেশ।…তাই দিস। লিলিটাকেও পুড়িয়ে খাস।

গোবিন্দ এক হাঁচকায় ট্রাঙ্ক বেডিং কাঁধে তুলে নেয়।

ছোট্ট মনি খিলখিল করে হেসে হাততালি দিয়ে বলে—গোবিন্দকা মুটে, গোবিন্দকা মুটে।

আট

ভঁাড়ার ঘরের পিছন দিকের জানলার ওদিকে চোরের মতো চুপি সারে এসে দাঁড়ায় সুব্রত। এদিকে দাঁড়িয়ে মুরলা।

সুব্রত চাপা আক্ষেপের সুরে বলে—দাদু, শেষটায় এই করলেন। ঈস্! ছি ছি, একবার শেষ দেখাটাও হলোনা।···তা শুনছি নাকি মামারা এই অশৌচের মধ্যেই ভাগ ভেন্ন হচ্ছে ?

— তাইতো দেখছি। ··আগে থেকেই মনে মনে ভেন্ন হয়ে ছিলো, নেহাৎ বাবার সামনে চক্ষু লজ্জায় পারছিলো না।···তা' তুই এমন ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ক'দিন ? আছিস কোথায় ?

'চোরের মায়ের' মতোই চুপি চুপি কথা কয় মুরলা।

— আছি এক জায়গায়। খবর রাখি সবই। ধ্যেৎ, বুড়ো গেলো গেলো এক কাণাকড়িও দিয়ে গেলো না। কাজটা ভালো হলো ?

— বাবা কা'র ওপরই বা কি ভালো করলেন ? এই যে আমি একটা বিধবা মেয়ে রয়েছি, তার আখের ভেবেছেন কোনোদিন ? মরে গেছেন স্বর্গে গেছেন। তবু বলি — আক্কেল বলে বিশেষ কিছু ছিলোনা।···তা' শোন্, তুই হ'লি গে তাঁর একমাত্র দৌত্তুর সন্তান, একেবারে ফাঁকে পড়বিই বা কেন ? এই রূপোর বাসন ক'টা তাঁর চিহ্ন হিসেবে রাখ তুই।

আঁচলের তলা থেকে বার করে জানলা দিয়ে গলিয়ে দেয় মুরলা, বাপের দরুন রূপোর রেকাবি গেলাস ডিবে বাটি চামচ।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু চামচটা হাতেই থাকে, দেওয়া হয় না।

হঠাৎ 'সুট্' করে মাথা নামিয়ে নেমে পড়ে সটকান দেয় সুব্রত
মুরলা চমকে ফিরে দেখে পিছনে বড়োবৌ।

— বাঃ ঠাকুরঝি বেশ! চমৎকার! বাড়ীর বাসন কোসন নিয়ে শিশি বোতল'ওলাকে বেচা হচ্ছে বুঝি? ওমা কি সর্ব্বনাশ রূপোর চামচ পর্য্যন্ত?

মুরলা কষ্টে হাসি হেসে বলে — কি যে বলো বড়ো বৌ? চামচখানা হাতে ছিলো। এখানে দাঁড়িয়ে একটা ভিখিরি ভিক্ষে চাইছিলো কিনা —

বড়োবৌ সন্দিগ্ধ সুরে বলেন — কি জানি ভাই, অনেকক্ষণ থেকে তো দাঁড়িয়ে আছো। লক্ষ্য করছি। ভিখিরির সঙ্গে এতো কিসের গপ্‌পো বুঝি না। তা' আমি বলছিলাম কি, শ্বশুর মশায়ের কাজকর্ম্ম মিটে গেলে তোমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে কে তোমার ভাসুরটাসুর আছে সেখানে একটা চিঠি লিখো। ...দুটো বিধবাকে পুষতে পারবে এমন বড়োমানুষতো তোমার ভাইয়েরা নয় ভাই। ...কি করবো 'মা' জিনিশ ফেলবার উপায় নেই, তাঁকে মাথায় করে বইতে হবে। ...তোমারই একটু বিবেচনা করা দরকার। ...দুর্গা! দুর্গা!

— দুর্গা, দুর্গা! তারা ব্রহ্মময়ী!

অবিরত মাতৃনাম উচ্চারণের সঙ্গে আলোচাল কাঁচকলা নিয়ে গোছগাছ করছেন ভটচায মশাই। মুখের ভাবে বিশ্বের বিরক্তি।

মুণ্ডিত মস্তক তিনপুত্র তিনখানি কুশাসন পেতে বসে আছে। সামনে অকিঞ্চিতকর সামান্য কিছু উপচার।

হঠাৎ বাইরে তুমুল একটা সোরগোল শোনা যায়।

উদ্দাম হয়ে উঠেছে গোবিন্দর গলা।

—বেশ করবো আনবো। নেহাৎ যে আমি ভিন্ন গোত্তর, মামার ছেরাদ্দ তো আমার দ্বাবা হবে না। তাই না — ওই চামারগুলোর খোসামোদ কবা এই বেরষোৎ সর্গের' সব সামিগ্রী জোগাড় করে এনেছি — ভটচায় মশাইয়ের ফর্দ্দ মিলিয়ে। করুক ওবা ছেরাদ্দ।

হুড়মুড় করে এসে পড়ে গোবিন্দ, মুটো মুটোর মাথায় রাশিকৃত জিনিষ চাপিয়ে! দবজার বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে ঠেলা গাড়ীতে খাট বিছানা বাসন।

কুশাসন ছেড়ে উঠে পড়ে তিন ভাই।

বাড়ীতে যে যেখানে আছে স্তম্ভিত বিস্ময়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গজ্জন করে ওঠে সুবিমল — মা, এর মানে?

দেষালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিলেন সন্তোষিণী, ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন — আমি কি করে জানবো বাবা?

— না তুমি জানবে না, জানবো আমি। এই যদি তোমার মনে ছিলো, আগে পষ্ট করে বললেই পারতে? ধার করে কজ্জ করে যেমন করে হোক করতামই। এভাবে পাঁচজনের সামনে অপদস্থ করবার দরকার ছিলো না।

বাড়ীর বাইরে কাঙালীব দলের হট্টগোল শোনা যায়।

পরিমল উঁকি মেরে দেখে এসে বলে — চমৎকার। মার্ভেলাস প্ল্যানটা বটে। কার মাথা থেকে বেরিয়ে ছিলো তাই ভাবছি। এর চাইতে তুমি নিজে হাতে আমাদের একগালে চুণ আর একগালে কালি দিয়ে দিলেই পারতে মা। গোবিন্দকে দিয়ে এতো অপমান করানোর চাইতে ভালো হতো।

সন্তোষিণীর ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে থর থর করে।

—তোমরা কি সত্যিই সেই সন্দেহ করছিস পরিমল?' গোবিন্দকে দিয়ে আমি —

— সন্দেহের তো কিছু নেই মা, যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। গোবিন্দ হঠাৎ লটারিতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে একথা তো বিশ্বাস করাতে পারবে না আমাদের? তা' টাকা যদি তোমার কাছে লুকোনো ছিলোই, মা, আমাদের হাতে দিতে পারতে। অবিশ্যিই পকেটে পুরতাম না।

মানুষের দুর্ব্যবহারে উদ্ধত গীতশ্রীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে কাতরভাবে এগিয়ে এসে মাকে আড়াল করে বলে — মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিওনা তোমরা মেজদা, দোহাই তোমাদের। তোমাকেই জিগ্যেস করি গোবিন্দদা, এসবের মানে কি? কি দরকার ছিলো তোমার এসব সর্দ্দারী করবার?

এতোক্ষণ গোবিন্দ একটু নীরব ছিলো, আবার উদ্দাম হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ।

— কেন করবোনা? আলবাৎ করবো? আমি কি কেউ নই মামার? ভটচায্যি যে মত দিলেনা, নইলে কে তোয়াক্কা রাখতো ওদের? নিজেই 'বেরবো' করতাম আমি!

গীতশ্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে — আচ্ছা আচ্ছা বেশ! কিন্তু টাকা পেলে কোথায় তাই শুনি?

— টাকা? দরকারের সময় টাকা আবার কোথায় পায় মানুষ? গয়না বেচলে টাকা হয়। এ তো কচিছেলেটাও জানে। এককাঁড়ি গয়না বাক্সে তুলে রেখে পচাবার কি দরকার নতুন বৌয়ের, তাই শুনি? ও গয়না ওকে দিয়েছিলো কে?

ইত্যবসরে পরিমলের শ্বশুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন — বাইরে

কী ব্যাপার হচ্ছে পরিমল? প্রায় দুশো তিনশো কাঙালী বাড়ী ঘেরাও করে চেঁচাচ্ছে! কে ডেকে এনেছে ওদের?

— জিগ্যেস করুন ওই রাস্কেলকে —

বলে গোবিন্দকে দেখিয়ে দেয় পরিমল।

পরিমলের শ্বশুর বলেন—তুমি কে হে ছোকরা? গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল! ওপর পড়া হয়ে ফোঁপর দালালী করতে এসেছে কিসের জন্যে?

গোবিন্দ চীৎকার করে ওঠে — খবরদার বলছি তালুই মশাই, ভালো হবেনা। বলি তুমি কি জন্যে এবাড়ীতে এসেছো মোড়লি করতে?... কি করবো গুরুজন, নইলে এক ঘুসিতে ওই টাক দু'ফাঁক করে ছাড়তাম।

— কি? কি বললি রাস্কেল? বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা! পরিমল ছুটে এসে আচমকা এক ধাক্কা দেয় গোবিন্দকে।

গোবিন্দও গা ঝেড়ে উঠে জামার আস্তিন গুটোতে বসে।

বড়বৌয়ের মা ডুকরে কেঁদে ওঠেন— ওমা একী সব্বনেশে কথা গো! আজকের দিনে একি খুনোখুনি ব্যাপার! ধন্যি বলি বেয়ানঠাকরুণকে, পেটের ছেলেকে খুন করতে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া! ছি ছি এ কি কেলেঙ্কার।

ভীড় জমেছে নানা দিক থেকে।

সহসা সবভীড় দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে উদভ্রান্তের মতো এগিয়ে আসেন সন্তোষিণী। গোবিন্দর সামনে দাঁড়িয়ে স্বভাব বিরুদ্ধ তীব্র কণ্ঠে বলেন — আমিও বলছি গোবিন্দ, বেরিয়ে যা তুই, এই দণ্ডে এবাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। শেয়াল কুকুরের মতো দূর দূর করে বিদেয় করে দিয়েছি, তবু তোর লজ্জা নেই হতভাগা? এই তোকে আমার মাথার

দিব্যি দিচ্ছি লক্ষ্মীছাড়া, ফের যদি তুই এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোস, মরা মুখ দেখবি আমার।

গোবিন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বসে—ক্ষীণকণ্ঠে বলে—মাথার দিব্যি? মরা মুখ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মাথায় দিব্যি, এবাড়ীর চৌকাঠ তুই আর ডিঙোবিনা।

নয়

'শ্রাদ্ধশান্তি' বলে কথা।

শান্তি অশান্তি যে ভাবেই হোক যামিনীমোহনের শ্রাদ্ধটা চুকে যাওয়ার পর গোবিন্দর আর রায় বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোবার উপায় থাকে না, কারণ সন্তোষিণী তা'কে মাথার দিব্যি দিয়ে বসেছেন।

অথচ সেই একটিমাত্র চৌকাঠ ছাড়া সারা পৃথিবীটাই যে তার কাছে অর্থহীন, ঝাপসা।

যখন তখন সে তাই মনোবেদনাটা গৌরীর কাছে ব্যক্ত না করে পারে না।

সেদিন নিজের টিনের চালাঘরখানার সামনে দাওয়ায় বসে বলে —আক্কেলখানা একবার দেখলে তো নতুন বৌ। চৌকাঠ ডিঙোবি না দিব্যি দেওয়া হলো! গোবিন্দ ওঁর পাকা ধানে মই দেবে!

গৌরী বলে — দিব্যি না দিয়েই ব' কববেন কি। তুমি কখন কি-ভাবে ওঁকে বিপদে ফেলবে কে জানে!

— কি হয়েছে? বিপদে ফেলবো? গোবিন্দ কপাল কুঁচকে বলে — বটে, গোবিন্দ বিপদে ফেলবে। আর ওঁর ওই সোনারচাঁদ বাপের ঠাকুররা রাজ্যপদ দেবে ওনাকে, কেমন? আমি এই বলে রাখছি নতুন বৌ —

গৌরী তাড়াতাড়ি বলে — থাক, থাক, তোমাকে আর ভয়ানক কিছু একটা বলে রাখতে হবে না। আমি একটা কথা বলি শোন — কালকে বলা হয়নি, তোমার ও পাড়ার সেই খেলার ক্লাবের ছেলেরা বাড়ী খুঁজে খুঁজে বার করে তোমাকে ডাকতে এসেছিল—

গোবিন্দ চমকে বলে — অ্যাঁ! তারপর? কি বললে তুমি?

— কি আর, বলে দিলাম তুমি বাড়ী নেই, এলে বলবো।

— যা ভেবেছি তাই! গোবিন্দ যেন চাবুক খাওয়ার মতো লাফিয়ে ওঠে — মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কতো হবে। কেন বলতে পারলে না 'গোবিন্দ টোবিন্দ বলে এখানে কেউ থাকে না!'

— ওমা সেকি! তা' বলবো কেন! তুমি কি ফেরারী আসামী?

— নাঃ তার চেয়ে ভারী একেবারে মান্যবান ব্যক্তি! দেখে গেলো তো রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের ভাগ্নে টিনের চালায় বাস করছে! মামার উঁচু মাথাটা হেঁট করে ভারী পৌরুষ হলো, কেমন?

মৃত মামা শ্বশুরের উঁচু মাথাটা গোবিন্দর আচার আচরণের দ্বারা নীচু হয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা এ নিয়ে আর অবুঝ পাগলের সঙ্গে তর্ক করে না গৌরী, বরং মমতার সুরে বলে — বলাটা ভুল হয়ে গেছে সত্যি, বুদ্ধিহীন মেয়েমানুষ বৈ তো নই? কিন্তু তুমিই বা তোমার কেলাব-টেলাব সব ছেড়ে দিয়েছো কেন? আবার যাওনা?

— দূর দূর — গোবিন্দ উদাসভাবে বলে — আর ভালো লাগে না ওসব! ছেলেবেলা থেকে ওসব বাঁদরামী না করে, যদি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারতাম! হয়ে রইলাম একটা অমনিষ্যি —

গৌরী সস্নেহে বলে — কে বললে অমানুষ হয়ে আছো? মানুষকে কি শুধু বি-এ, এম-এ, পাশ দিয়ে মাপতে হয়?

— হয়ই তো — গোবিন্দ হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে — আলবাৎ হয়, এই যে মামী আমাকে শেয়াল-কুকুরের মতন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে, মুখ্যু চাষা বলেই না? চারটে পাশ করে চারখানা পা যদি আমার গজাতো, পারতো?

গৌরী বলে — ছিঃ ওরকম কথা ভাবতে নেই। অনেক দুঃখেই তিনি তোমাকে —

— জানি জানি! গোবিন্দ গৌরীকে কথা শেষ করতে দেয় না, বলে সব জানি, সেই জন্যেই তো ইচ্ছে হয় সমস্ত পৃথিবীটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে কোনো চুলোয় চলে যাই।

গৌরী হেসে ফেলে — কষ্টকরে আর আগুন ধরিয়ে দিতে হবে কি? তোমার মনের আগুনেই কোন দিন না ভস্ম হয়ে যায়।

গোবিন্দর মনের অবস্থা সে বোঝে।

চেষ্টা করে তার ভারাক্রান্ত মনটাকে কিছুটা হালকা করে দিতে।

যদিও ক্লাবের নামে পরম উদাসীনের ভাণ দেখিয়েছিলো গোবিন্দ, তবু পরদিনই গুটি গুটি ও পাড়ার দিকে রওনা হয়। তবু তো ও পাড়ায় যাওয়ার একটা সত্যিকার উপলক্ষ্যও জোটে।

যদিও এতো দূরে বাসা গোবিন্দর, যে এপাড়া ওপাড়া না বলে এদেশ ওদেশ বলাই উচিৎ।

ক্লাবে উৎসব পড়ে যায় গোবিন্দকে দেখে।

'গোবিন্দদা' তাদের দলের মধ্যমণি। গোবিন্দ বিহনে তাদের বৃন্দাবন অন্ধকার হয়ে আছে। সবাই 'গোবিন্দদা' গোবিন্দদা' করে অস্থির করে তোলে।

অনেক দিন পরে মনটা একটু হালকা হয়ে যায়।

মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা!

কী সুখের জীবনই ছিলো!

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে শীস্ দিতে দিতে বেরোচ্ছিলো।

কিন্তু ফুটপাথে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

ডান হাতি খানিকটা গেলেই বাসস্টপ, কিন্তু পা দু'খানা কেন বাঁদিকে যেতে চায়?

রায়বাহাদুর যামিনীমোহনের নেম্‌প্লেট আঁটা তিনতলা সেই বাড়ীখানা যেন কী এক অদৃশ্য সূত্রে টানতে থাকে।

বাইরে থেকে একবার দেখে গেলে কী ক্ষতি?

সত্যি কিছু আর গেটের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে যাচ্ছে না সে, একবার শুধু খানিকটা দূর থেকে —

এমনও তো হতে পারে ঠিক এই সময় সন্তোষিণী দোতলায় নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়েছেন একটু! এ সময় কিই বা এমন কাজ মামীর? ঘরে আলো জ্বললে কতো দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় মামার সেই প্রকাণ্ড পালঙ্কটার মাথার দিকের উঁচু বাজুটা। সেকেলে নক্সাদার দামী পালঙ্ক, দেখবার মতো জমকালো বাজু।··· শন্ শন্ করে ঘোরে পাখার ব্লেড্, তার ঘূর্ণায়মান ছায়াটা যেন ঘরের আলোটাকে খণ্ড খণ্ড করতে থাকে। ····আগে কতোদিন ক্লাব থেকে ফিরতে একটু রাত হয়ে গেলেই চোরের মতো চুপি চুপি আসবার সময় ওপর দিকে তাকিয়েছে গোবিন্দ। মামা দাঁড়িয়ে নেইতো জানলায়? তা'হলেই তো গোবিন্দ গেছে!

সন্তোষিণীর যে আজকাল দোতলার ঘর থেকে 'ডিমোশান' হয়ে গেছে সে কথা গোবিন্দর কল্পনার বাইরে। কি করে ধারণা করবে সে — কক্ষচ্যুত সন্তোষিণীর স্থান এখন গোবিন্দর পরিত্যক্ত কক্ষে!

না সে ঘরে পাখা নেই।···ঘুরন্ত ব্লেডের তাড়নায় কুচি কুচি হবার মতো প্রখর আলোও নেই সে ঘরে।

পঁচিশ পাওয়ারের একটা বালব জ্বলে। স্তিমিত নিষ্প্রভ।

ইতস্তত: করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে হঠাৎ চমকে দেখে সামনেই গীতশ্রী।

কেমন যেন শীর্ণ শ্রীহীন।

বেশভূষায় পরিপাট্যের অভাব।...এমনই অভাব যে গোবিন্দর মতো অন্যমনস্ক ব্যক্তিরও চোখে ঠেকে।

— গীতা তুই! এসময় এখানে? ...এরকম দাঁড়কাকের মতো চেহারা কেন!

গীতশ্রী ম্লান হাসে।

— কি, এতোক্ষণ ধরে কলেজ হচ্ছিলো!

গীতশ্রী শুধু বলে — কলেজ নয়।

— কলেজ নয়? ওঃ আড্ডা। মামা মরতে মরতে দিব্যি ডানা গজিয়েছে দেখছি। তা' স্বরাজ পেয়ে চেহারাটা খুব বানিয়েছিস তো! বাঃ! চুলগুলোই বা অমন বিশ্রী ঝুড়ি করে বেঁধেছিস কেন? সেই সাপের মতো বিনুনি দু'টো গেলো কোথায়?

কেশ বেশের পারিপাট্যের আধিক্য দেখে গোবিন্দই আগে কতো ক্ষেপিয়েছে গীতশ্রীকে, বলেছে 'পটের বিবি' 'ডলি পুতুল'।

অথচ আজকের ওর এই শ্রীহীনতা মূর্খ গোবিন্দর মনটাকে যেন ধাক্কা মারে।

বুঝতে পারে গীতশ্রী।

তবে, বলেনা কিছু, শুধু মৃদুহাসির সঙ্গে বলে—বেণী ঝুলিয়ে অফিসে গেলে লোকে হাসবে যে!

অফিস!

গোবিন্দর মুখের হাঁ বুঁজতে চায়না।

—তুই আপিস যাস?

— যাই তো।

— বলি আপিসটা কিসের ?

— ওই যাহোক একটা কিছুর।

— হুঁ! গোবিন্দ দুই হাতের মুঠো দুই গালে ঠেকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে — বুঝেছি! দাদারা আর ভাত দিচ্ছে না! বেশ! বেশ!… তা — মামীর খবর কি ? আছেন না মরেছেন ?

— কাছাকাছি! গীতশ্রী বলে — খুব অসুস্থ! অফিস ফেরত মারই দু' একটা ওষুধ কিনতে গিয়ে আরো দেরী হয়ে গেলো।

— খুব অসুখ ?…ব্যাকুল গোবিন্দ সকাতর প্রশ্ন করে—যা ভেবেছি! কি অসুখ ? ডাক্তারবাবু কি বলেন ?

সহরের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার বরাবর যামিনীমোহনের গৃহ চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন, গোবিন্দ তাঁর কথাই বলে।

গীতশ্রী বলে — ডাক্তারবাবু নয়, মেজদার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কের কে এক কবরেজ — তিনিই দেখছেন! ঝঞ্চাটের ওষুধ কেউ তেমন গা করে না, কদিন থেকে আনা হচ্ছেনা দেখে আমিই আজ — আচ্ছা — গোবিন্দ দা' যাই তা' হলে ?…তোমারও তো রাত হয়ে যাচ্ছে —

হঠাৎ খাপ্পা হয়ে ওঠে গোবিন্দ — থাক থাক আমার রাত হয়ে যাচ্ছে কি দিন হয়ে যাচ্ছে ভাবতে হবেনা কারুর! ভয় নেই, বেহায়া গোবিন্দ যাচ্ছেনা ও বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে। মামীকে যখন তোরা খাটে করে বের করবি, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখবো! বুঝতে পারছি দেরীও নেই তার … মামাকে মেরেছে, এবারে মামীকেও —

অকস্মাৎ কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের কোণটা মুছে নিয়ে দ্রুতপদে বিপরীত দিকে চলতে সুরু করে গোবিন্দ।

দশ

সন্তোষিণীর ছেলেরা অসুস্থ জননীর যথোচিত যত্ন করেনা একথা বললে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তাদের নামে।

পরিমলের পিস্‌শ্বশুর রাজীব কবরেজ হামেসাই আসেন। নাড়ি টেপেন, জিভ দেখেন, ওষুধের অনুপান বদলে দিয়ে যান।

বড়ো মেজো দুই ছেলে দু'বেলা খোঁজ নিযে যায় মার, একজন অফিস বেরোবার সময়, একজন অফিস থেকে ফিরতে।

নীচের তলায় ঠিক সিঁড়ির পাশেই পড়ে কিনা ঘরটা।

বধূমাতারাও নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট টাইমে এক একবার নীচে নামেন। শাশুড়ীর কুশল প্রশ্ন করেন, সাবধানে থাকবার উপদেশ দেন, এবং সন্তোষিণীর ইচ্ছাকৃত অসাবধানতাই যে রোগ বৃদ্ধির মূল কারণ, পাকে প্রকারে সে কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েননা।

দুই বৌয়ের ডিউটির সময়ও অবশ্য আলাদা আলাদা।

তবে দৈবাৎ এক-আধদিন মুখোমুখি হয়ে গেলে, শাশুড়ীর তদ্‌বির তদারকীর প্রতিযোগিতা চলে।

মেজোকে শুনিয়ে বড়ো বলেন — মা'র ফলটল সব আছে তো গীতা? সময় থাকতে লক্ষ্য রেখো।

গীতা সামনের তাকে রক্ষিত 'ফলটলের' দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে সম্মতিসূচক মৃদু ঘাড় নাড়ে।

একটা ছোট্ট চুপড়ির ভেতর থেকে গোটা কয়েক শুকনো পানিফল

আর আধখানা কাটা শশা যেন তীক্ষ্ণ কটাক্ষে উপস্থিত সকলের দিকে অ[illegible]কা হাসি হাসতে থাকে।

বলা বাহুল্য ফলের ভার বড়ো গিন্নীর।

মেজো গিন্নীর ভার দুধের। বদান্যতায় মহিয়সী তিনি শাশুড়ীর খাতে পুরো আধসের দুধের বরাদ্দ রেখেছেন। অতএব —

অমায়িক কোমলকণ্ঠে শুধান — দুধটা গয়লা ঠিক মতো দিচ্ছে তো? বিধবা মানুষের পুষ্টিকর বলতে তো ওই দুধটুকুই ভরসা।

মায়ের সম্বন্ধে 'বিধবা' শব্দটার প্রয়োগ যেন কানের পর্দায় শিহরণ এনে দেয় গীতশ্রীর। প্রায় সাত-আট মাস হয়ে গেলো মারা গেছেন যামিনীমোহন, তবু যেন শব্দটা অসহনীয়।

বাপের শোক সহ্য করা যায়, সহ্য হয় না মায়ের বৈধব্য!

যাই হোক এবারেও ঘাড় নাড়ে সে

— আমার মনে হয় — মেজবৌ মাঝে মাঝে বলেন — অতিরিক্ত শুয়ে থাকাই এতো দুর্ব্বলতার কারণ। শরীরের কিছু এক্সসাইজ দরকার, ওর অভাবে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়।

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে গীতশ্রীর, অনেক সহ্য শক্তি বেড়েছে। তবু এহেন হিতোপদেশে বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে না।

বলে — দরকার বুঝি? ওঃ। তা কোন্ কোন্ কাজগুলো করলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় মেজবৌদি? বাসন মাজা? মসলা পেষা? সাবান কাচা?

— ও বাবা, মেজাজ একেবারে মিলিটারী! সাধে কি আর এদিক মাড়াতে চাই না — বলে ঠিকরে বেরিয়ে যায় মেজবৌ।

সন্তোষিণী মৃদুস্বরে বলেন — কেন তুই সাপের ল্যাজে পা দিতে যাস গীতু?

— কি করি বলো। সব সময় সহ্য করা শক্ত হয়। কিন্তু না দিলেই কি সাপ ছোবল মারতে ছাড়ে মা? বড়দির কথা ভাবো।

সন্তোষিণী একটা নিঃশ্বাস ফেলে নীরবে থাকেন।

বিধবা কন্যা মুরলার কথা মনে পড়ে গিয়ে বুকের ভিতর কি করতে থাকে তাঁর, বাইরে থেকে বোঝা যায়না। …মুরলা মুখরা হোক, অবুঝ হোক, নির্বুদ্ধি হোক, তবু সে সন্তোষিণীর প্রথম সন্তান। দুঃখী-সন্তান।

সেই মুরলা চোখ ছাড়া রয়েছে আজ চার মাস।

শ্বশুরবাড়ীর দেশে কোন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়ে আছে মুরলা।

বাপের মৃত্যুর পর সবে যখন বড়ো-মেজো দুই ভাইয়ের হাঁড়ি ভিন্ন হয়েছে এবং মুরলা কার ভাগে পড়বে সাব্যস্ত হচ্ছে না, তখন — 'বড়ো গাছে নৌকো বাঁধার নীতিতে মুরলা খুব তোয়াজ করতে সুরু করেছিলো বড়োভাজকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিতৃভিটে ত্যাগ করতে হলো তাকে সেই বড়োবৌয়ের ছোবলের বিষে।

নির্ম্মল অবিবাহিত, আলাদা হাঁড়ির ঠিকমত ব্যবস্থা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা' ছাড়া খুব বেশী দরকারও ঘটেনি। মেজোবৌয়ের ছোটো বোনটি বিয়ের মতন বড়ো হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত, মেজবৌ এম-এ পাশ রোজগারী ছোটো দেওরটিকে চক্ষের মণি দেখতে সুরু করেছে। নির্ম্মল তার ভাগে।

নির্ম্মলও আজকাল বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হিসেবে মেজদার শ্বশুরবাড়ীটাকেই সানন্দে নির্ব্বাচন করে নিয়েছে।

আপাতত কিছুদিন থেকে সে হাওয়ায় ভাসছে। সন্তোষিণীর সামান্য শরীর খারাপের কথা তার মনে পড়বার কথা নয়, তা' ছাড়া — তার সময় কোথা?

এগারো

বয়সে বুড়ো না হলেও 'বুড়োমি' করাটা কবিরাজী শাস্ত্রের অন্তর্গত, কাজেই আধা-বয়সী রাজীব কবরেজকে 'বুড়ো'র ভাণ করতে হয়।

রোগী দেখার ছুতোয় প্রায়ই আজকাল শ্যালকদুহিতার শ্বশুর-বাড়ীতে আবির্ভাব ঘটে তাঁর।

তবে এসেই যে রোগী দেখতে ঢোকেন তা' নয়। লাঠি ঠুকঠুক করে ওপর তলায় ওঠেন, মিশ্রীর সরবৎ, বেলের পানা, স্পঞ্জ রসগোল্লা, বাটাছানার সন্দেশ, ইত্যাদি কবিরাজভোগ্য ভালো ভালো বস্তুগুলি উদরসাৎ করেন, দ্রবীভূত স্নেহে নাতিনাতনীদের আদর করেন, তাদের সভ্যতা ভব্যতা আচার আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন, অতঃপর নেমে চলে যাওয়ার সময় বুড়োর ভঙ্গীতে লাঠি ঠুকঠুক করতে কবতে সিঁড়ির পাশে সন্তোষিণীর ঘরে ঢোকেন।

বিছানার চৌকীর কাছে বেতের একটা মোড়া পাতা থাকে, তা'তেই একটু আলগোছ হয়ে বসে একটু নকল কাশি কেসে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেন — কই বেয়ান নাড়িটা দেখি —

প্রচলিত প্রথায় — আর বেহাই মরণ হলেই বাঁচি, আর কেন থাকা — প্রভৃতি মামুলি বাকবিন্যাসের ভাষা সন্তোষিণীর মুখে আসে না কখনো, তিনি নীরবে হাতখানা বাড়িয়ে দেন।

রাজীব কবরেজ ধ্যানস্থের ভঙ্গীতে মিনিটখানেক ধরে নাড়ি ধবে থেকে একটা বিজ্ঞতাসূচক 'হুঁ' উচ্চারণ করে গীতাকে উদ্দেশ করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন — ওষুধের কাজটা ঠিকমতো হচ্ছে না কেন

বলো দিকি — মকরধ্বজটা মাড়া ভালো হচ্ছেতো? অনুপান ঠিক আছে?

গীতা ঘাড় হেলায়।

— সকালে পানের রস আর সন্ধ্যেয় বড়ো এলাচের গুঁড়োর সঙ্গে মধু — এই দিয়েছিলাম না?

—হ্যাঁ!

—আচ্ছা সকালে পানের রসটা বদলে পটলের রস দিও দিকি।··· সন্ধ্যেরটা ওই চলুক দু'দিন।···কিন্তু বাপু আমার মনে হচ্ছে কিছু অনিয়ম হচ্ছে—তা' নইলে।

গীতশ্রী ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলে—কিছু অনিয়ম হচ্ছেনা।

—বললে শুনবো কেন? গুরুর কৃপায় আমার ওষুধ 'ডেকে কথা কয়', নিস্ফলা হতেই পারেনা। নিশ্চয়ই কোনোখানে গোলযোগ হচ্ছে।

গীতশ্রী গম্ভীর ভাবে বলে—তা' হলে হচ্ছে।

রাজীব একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে নিয়ে সন্তোষিণীকে উদ্দেশ করে বলেন—বেয়ানের মেয়েটি একটু জ্যাঠা!··· হবেই তো—একেই কালের স্বধর্ম্ম তায় আবার রোজগেরে মেয়ে! শ্বশুর ঘরের ভয় তো নেই।···আচ্ছা তা' হলে আজ উঠি।

কবরেজ মশাই বেরোবার আগেই চটকরে একটা ছায়া সরে যায় দরজার কাছ থেকে।

না কোনো গুপ্তচরের নয়, ছায়াটা নির্ম্মলের।

ও যখন বেড়িয়ে ফেরে, প্রায়ই সন্তোষিণী ঘুমিয়ে পড়েন, দরজা ভেজানো থাকে। আজ দৈবাৎ একটু সকলে সকাল ফিরেছে, ঢুকছিলো মনের আনন্দে টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েই

নজরে পড়লো ঘরে কবরেজ মশাই, মেজদার পিস্‌শ্বশুর! অদূর ভবিষ্যতে তার নিজেরও পিস্‌শ্বশুর হবার সম্ভাবনা।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পারলোনা। অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো রুগ্ন জননীর অনাড়ম্বর পরিবেশের দিকে।

অনাড়ম্বর? না বড়ো বেশী রিক্ত?

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অনেকদিন আগের একটা দৃশ্য!

ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে এসেছিলেন সন্তোষিণী। কী রাজকীয় আড়ম্বরে সেবা শুশ্রূষা চলেছিলো! নির্মল কোলের ছেলে, মায়ের জন্যে আনা আঙুর আপেল বেদানা কমলার ভাগ খেতে খেতে ফলে অরুচি ধরে গিয়েছিলো তার।

উৎকণ্ঠিত যামিনীমোহন মাথার কাছ থেকে নড়তে চাইতেন না। বাড়ীসুদ্ধ ছেলে বুড়ো সবাই তটস্থ! সন্তোষিণীর একটু আরাম আয়েসের জন্যে অসাধ্য সাধন করতে পারে বুঝি বা!...

রাজীব কবরেজ ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে না থাকলে হয়তো ঢুকে পড়তো, ইতস্তত: করতে করতে কেমন একটা চক্ষু লজ্জায় ঝট করে সরে গেলো।

কিছুক্ষণ পরেই ডাক দিলো — গীতা! গীতা!

গীতশ্রী এসে দাঁড়ালো — কি বলছো ছোড়দা?

— বলছি — বলছি সারাদিন সব করিস কি? মার বিছানা টিছানাগুলো কী বিশ্রী হয়েছে চোখে পড়ে না? বাড়ীতে ধোবার পাট উঠে গেছে নাকি?

গীতা একটু কঠিন হাসি হেসে বলে — গেছে কি না খোঁজ নিও। কিন্তু মার ভাগ্যটা হঠাৎ ফিরে গেলো কেনো বলোতো? ভাবনা ধরিয়ে দিলে'যে —

— রাবিশ!

বলে বোনের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চলে যায় নির্ম্মল।

হয়তো — এমনি এক-আধ সময় কারুর কারুর মনে শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু দাঁড়াতে পারে না সেটা। উচ্চশিক্ষার উচ্চ পালিশ লাগানো মন থেকে সহজেই পিছনে পড়ে যায়।

মনের যন্ত্রণা অহরহ কুরে কুরে খায় শিক্ষাদীক্ষাহীন অমার্জ্জিত মনকে, মসৃণতার অভাবে পিছলে পড়তে পারে না। তাই যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মূর্খ অশিক্ষিত গোবিন্দ।

সন্তোষিণীর শক্ত অসুখ, সন্তোষিণী বিছানায় পড়ে, আর গোবিন্দর চোখে দেখাটুকুরও অধিকার নেই! এ কী অদ্ভুত ঘটনা!

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীখানার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় গোবিন্দ, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দোতলার সেই ঘরখানার দিকে। কিন্তু আশ্চর্য্য! কোনোদিন কি জানলা দুটো খোলা থাকতে নেই? জ্বলতে নেই আলো। এতোই কি অসুস্থ সন্তোষিণী, যে একটু খোলা হাওয়া খাবারও হুকুম নেই।

দোতালার সেই ঘরখানার বর্ত্তমান মালিক যে কতোদূর বিচক্ষণ সেকথা গোবিন্দ জানবে কেমন করে!

আলো জ্বালালেই যে পয়সা খরচ হয়, নিজের পয়সায় হাত পড়ার পর থেকে সে সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন আছেন বড়োগিন্নী।

বারো

হঠাৎ একদিন রাজীবকে রাস্তায় পাকড়াও করলো গোবিন্দ।

— আপনি কে মশাই ?

— সে কথায় তোমার দরকার কি হে ছোকরা ?

খিঁচিয়ে ওঠেন রাজীবলোচন।

— আছে দরকার — গোবিন্দ পথ আগলায় — আপনিই সেই কবরেজ বুঝি ? ... হুঁ ... সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন। ... বলি রুগী দেখলেন কেমন ?

—তোমার জানবার প্রয়োজন ?

চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করেন রাজীবলোচন।

হঠাৎ ধমকে ওঠে গোবিন্দ— প্রয়োজন আছে কি নেই আমি বুঝবো, তোমাকে যা বলছি তার উত্তর দাও দিকিন ? ...নইলে এই দেখ —

জামার আস্তিনটা গুটিয়ে পেশীসবল বলিষ্ঠ হাতখানা সামনে বাড়িয়ে ধরে গোবিন্দ।

রাগ হলে আর 'আপনি আজ্ঞের' গণ্ডিতে আটকে থাকতে পারেনা সে।

—দুর্গা ! দুর্গা ! ভর সন্ধ্যাবেলা একী বিপত্তি ! আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেলো তো ! ... বলি রোগ তো একটা নয় বাপু, জ্বর জরা শোক তাপ মিলিত ব্যাধি। ও কি সহজে সারে ?

—'ছেদো কথা রাখো সহজে হোক, শক্তয় হো'ক সারবে কি না ?

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গোবিন্দ।

—কী মুস্কিল!

রাজীব সভয়ে একবার গোবিন্দর প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতির দিকে তাকিয়ে বলেন—কী মুস্কিল! সারবে না কে বলেছে? আয়ুর্ব্বেদে মরাকে বাঁচাবার ওষুধ পর্য্যন্ত আছে, বুঝলে বাপু? ···ওঁর যা রোগ বায়ু পরিবর্ত্তনে সারে।

—বটে? তা' সে হুকুম হচ্ছেনা কেন?

—ভ্যালা ফ্যাসাদ হলো তো! আমরা চিকিৎসক, বিধান দিতে পারি রুগীকে হাওযা খাইয়ে আনবার দায়িত্ব তো আমাদের নয়।··· অসময়ে একি বিপদ! সরো দিকি, সরো!

—উঁহু। এখুনি সরছিনা। সব কথার জবাব চাই। হাওয়া বদলের দরকার তো, হাওয়া একেবারে বন্ধ কেন? চব্বিশ ঘণ্টা রুগীর ঘরের জানলা আটকে রাখা কি রকম চিকিচ্ছে?

রাজীব গোবিন্দর দৃষ্টি অনুসরণ করে বলেন—ও ঘরে কি? ও ঘরে কে আছে?

—কেন? মামী। অসুখ কার? মামীরই তো?

নির্ব্বোধের মতো তাকায় গোবিন্দ।

—ওঃ মামী! তুমিই বুঝি বেয়ান ঠাকরুণের সেই পুষ্যি ভাগনেটি? মামীর জন্যে এতো দরদ কেন বুঝেছি এবার। বোকাশোকা ভালোমানুষ মামীটির মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক সুবিধে হয় কি বলো? মামী মরলে সেটি তো আর —

—খবরদার! মুখ সামলে —

বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গোবিন্দ—ওই দাঁতের পাটিটি বাঁধানো তাই, না হলে, আজ আর আস্ত পাটি নিয়ে ফিরতে হতোনা। কাঁচা দাঁত ঘুঁসিয়ে ছাতু করতাম।···রুগী কোথায়? বলো শীগগির!

— আরে বাবা, নীচেরতলায় ওই তো ওপাশের ওই ঘরে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে!

হন্ হন্ করে এগিয়ে যান রাজীবলোচন কবিরাজ।

কবিরাজের অঙ্গুলি নির্দ্দেশিত "ওপাশের ঘরের" একপাট কপাট খোলা জানলা দিয়ে যে ক্ষীণ আলোক রেখাটুকু অন্ধকারের মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, সেই দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে গোবিন্দ।

ওই ঘরে সন্তোষিণী শুয়ে আছেন!

রোগশয্যায়!

হয় তো বা শেষ শয্যাতেই!

গোবিন্দর পরিত্যক্ত ঘরে। ...যে ঘরে ঢুকে কতোদিন সন্তোষিণী ব্যথিত মন্তব্য করেছেন —আহা ঘরখানা তোর বড্ডো গরম গোবিন্দ! পঞ্চাশখানা ফ্যান্ বাড়ীতে, এ ঘরে যদি একখানা —

কথা শেষ করতে পারেন নি নিজের ছেলেদের ব্যঙ্গহাস্যরঞ্জিত মুখের চেহারা স্মরণ করে।

গোবিন্দই হেসে উড়িয়েছে। ...কী যে বলো মামী? মোমের পুতুল নাকি, যে গরমে গলে যাবো।

কিন্তু মামী।

গরমের দিনে কুটনো কুটতে বসলে যাঁর পাশে টেবিল ফ্যান বসিয়ে দেওয়া হতো — হার্ট উইক মানুষ, গরমটা ক্ষতিকর বলে!

উঁচু বনেদের বাড়ী।

নীচেরতলার ঘরের জানলাগুলোও মেঝে থেকে উঁচু উঁচু। রাস্তা থেকে জানলা দিয়ে উঁকি মারা যায় না, বড়োজোর জানালার

নীচে মাথা ঠোকা যায়! পরীক্ষা করা যায় জানলার কাঠের চাইতে মাথার কাঠামোটা শক্ত কিনা।

নিরুপায় আক্রোশে সেই পরীক্ষাই করতে থাকে গোবিন্দ।

মাথা ঠোকে আর ভাবে — 'সত্যিই কি মাথার দিব্যি'। জিনিশটা অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘন করে ফেললে সত্যিই দিব্যদাতার অমঙ্গল হয়? হয় আয়ুক্ষয়? তাই নিশ্চিত আয়ুক্ষয়ের নিদর্শন দেখেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে ভবিষ্যৎ আয়ুক্ষয়ের আশঙ্কায়?

গোবিন্দর নিরুপায় ছটফটানির ধাক্কা কাঠের জানলাটা ছাড়া আর একজনকেও খেতে হয়, সে হচ্ছে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি গৌরী।

বাড়ী ঢুকেই গোবিন্দ যখন উদ্দাম প্রেম আহ্বানে হাঁক দেয় — নতুন বৌ! নতুন বৌ! ··· কানে কালা হয়ে বসে আছো নাকি? ··· তখন হাতের কাজ ফেলে একখানা পাখা হাতে নিয়ে ত্রস্তে ছুটে আসে সে।

বলে — কি বলছো গো?

গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে ওর হাত থেকে পাখাখানা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে — বলছি? বলছি — আমি না হয় হতভাগা লক্ষ্মী ছাড়া বোম্বেটে, আর তুমি? তুমি কি?

— আমি? গৌরী হতচকিত প্রশ্ন করে — আমি কি?

— বলি তুমি এতো নেমকহারাম কেন? এই যে মামী মরতে পড়েছে, তুমি একবার দেখতে যেতে পারো না? মামী কি তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে?

গৌরী অবাক বিস্ময়ে বলে — আমি কেমন করে যাবো?

গোবিন্দর সঙ্গে ভিন্ন একা যাওয়া তার পক্ষে কি করে সম্ভব, ভেবে অবাক্ হয় বেচারা।

কিন্তু বাস্তব বুদ্ধিহীন গোবিন্দর সে খেয়াল কোথায়?

সে আরো হুমকি দিয়ে ওঠে — কি করে যাবে? ওঃ তাও তো বটে, চতুর্দ্দোলা চাই! তা' নইলে মহারাণীর মানের কানা খসে যাবে যে। যার মরণ বাঁচন রোগ হয়েছে, সে তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিতে পাঠাবে কেমন? ... কেন তোমায় নিয়ে গিয়ে দোর থেকে ছেড়ে দিতে পারিনা আমি?

গৌরী অভিমান ভরা স্বরে বলে — পারো তো নিয়ে যাওনা কেন?

— বলি মুখ ফুটে বলেছো কোনোদিন? বলেছো — "ওগো মামীকে অনেকদিন দেখিনি একদিন দেখতে ইচ্ছে করে?" পরের মেয়ে আর কতো হবে?

গৌরী সাগ্রহে বলে — তা তুমিও চলোনা গো। গুরুজন কি বলেছেন না বলেছেন, মনে পুষে রেখে কষ্ট পাবার কি দরকার? গেলে আর তোমার মান যাবে না।

— মান? গোবিন্দ যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে — গোবিন্দর মান অতো ঠুন্‌কো নয় যে কথার বাতাসে ভেঙে পড়বে। ... মাথার দিব্যি ঠেলে আমি যাই আর, মামীর মাথাটা খাই, এই তোমাদের ইচ্ছে কেমন?

গোবিন্দর মনের বাতাস কোন মুখো বইছে সেটা বুঝতে পারে না গৌরী, নিরুপায় হয়ে ফেলে দেওয়া পাখাখানা কুড়িয়ে এনে নীরবে ওর গায়ে বাতাস দিতে থাকে।

এবারে আর পাখা ফেলে দেয়না গোবিন্দ, কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ গৌরীর

পাখাধরা হাতখানা চেপে ধরে সাগ্রহে বলে — আচ্ছা নতুন বৌ, পেছনের উঠোনের পাঁচালটা এমন কি উঁচু ?

গৌরী এহেন আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলোনা, বিমূঢ় ভাবে বলে — কোন উঠোনের ?

— কোন উঠোনের ? গোবিন্দ জ্বলে ওঠে — রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের বাড়ীর গড়নটাই একেবারে বেবাক ভুলে গেছো কি বলো ? হবেই তো — পরের মেয়ে আর কি হবে ! বলি পাঁচ পাঁচটা বছর তো বাস করে এলে, উঠোনের পাঁচীলটা কতো উঁচু, একটা জোয়ান মদ্দ লোকে ডিঙোতে পারে কিনা সে হুঁস্ হয় না ?

গৌরী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলে — খুব উঁচু নয়।

— তবে ? গোবিন্দ সানন্দে বলে — চৌকাঠ ডিঙোতেই মাথার দিব্যি দেওয়া আছে, পাঁচীলের ওপর তো দিব্যি দেওয়া নেই ? আমি যদি পাঁচীল ডিঙিয়ে ঢুকি, কি করতে পারে মামী ?

সমস্যা। সমাধানের এমন একটা প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করে ফেলে উৎফুল্ল হাস্যে স্ত্রীর বিপন্ন মুখের দিকে তাকায় গোবিন্দ।

কি উত্তর দেবে গৌরী ? কতোখানি আকুলতায় ক্ষ্যাপা লোকটা এমন অদ্ভুত কল্পনাও করতে পারে তাই মনে করে শঙ্কিত হয়।

ব্যাকুল ভাবে বলে — ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ওসব করতে যেওনা, ওরা তাহলে 'চোর' বলে পুলিশে দেবে তোমাকে !

চোর ! তাইতো !

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গোবিন্দ।

তা' গোবিন্দর ধরন ধারণটা চোরেই মতোই দেখায়।

কাজ কর্ম্ম চুলোয় গেলো তার, যখন তখন এসে ঘুরে বেড়ায়

মামার বাড়ীর আশে পাশে। ··· ঝি চাকর কাউকে বেরোতে দেখলেই, তার সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে আলাপ জমিয়ে 'গিন্নীমার' খবর জানতে চায়।

এখনকার লোকগুলো সকলেই প্রায় নতুন, গোবিন্দকে চেনেনা। কেউ গ্রাহ্য করে দুটো উত্তর দেয়, কেউ অগ্রাহ্যভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

একটা ঝি তো একদিন বাজার থেকে ফিরে হাত মুখ নেড়ে রীতিমত ব্যাখ্যানা সুরু করে দিলো 'মনিবানীদের' কাছে। একটা 'গুণ্ডো মতন' লোক নাকি কেবল এই বাড়ী পানে তাকিয়ে থাকে, একে তাকে ডেকে সন্ধান শুলুক জানতে চেষ্টা করে, মতলব খারাপ তাতে আর সন্দেহ কি। তা' সেও সোজা মেয়ে নয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছে তাকে।

কথাটা গীতশ্রীর কানে যায়।

প্রশ্ন করে কেমন দেখতে লোকটা! ঝিয়ের মুখে বর্ণনা শুনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তার নিশ্চিত ধারণা হয়, এ আর কেউ নয় গোবিন্দ।

এদিকে অস্থির গোবিন্দ একদিন ছোটে ডাক্তার দাশগুপ্তর কাছে। যামিনীমোহনের আমলে তো অনেক সময় দেখেছে তাঁকে।

সকাতরে বলে — ডাক্তারবাবু, মামীর খুব অসুখ।

ইদানীং আর ও বাড়ীতে তেমন যাওয়া আসা নেই ডাক্তারের, গোবিন্দকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলেন — তাই নাকি? কি হয়েছে?

— জানিনা ডাক্তারবাবু, বড়দা মেজদা এখন হাড়কেপ্পন হয়ে গেছে, একটা হাতুড়েবদ্যির হাতে ফেলে রেখে দিয়েছে মামীকে, মামী আর বাঁচবে না। মেরে ফেলবে ওরা!

ব্যাপারটা বোধ হয় কিছু বোঝেন ডাক্তার, মৃদু হেসে বলেন — তাঁর ছেলেরা যদি তাঁকে মেরে ফেলবার প্রতিজ্ঞাই করে থাকেন, তুমি আমি কি করতে পারি বলো ?

— তা হবেনা। গোবিন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলে — আমি কি কেউ নই ?

— আমার কোনো রাইট নেই মামীর ওপর ? আপনি একবার দেখতে চলুন ডাক্তার বাবু — বিনীতভাবে গোবিন্দ পকেট থেকে বত্রিশটা টাকা বার করে সসঙ্কোচে ডাক্তারবাবুর টেবিলে রাখে।

কাল সন্ধ্যায় মাইনে পেয়েছে সে।

ডাক্তার বোঝান ওর ছেলেরা 'কল্' না দিলে হঠাৎ যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু গোবিন্দ নাছোড়বান্দা।

যুক্তিতর্কের অভাব অবশ্য তার ভাড়ারেও নেই। তবে সে গুলো নিতান্তই তার নিজের মতন এই যা।

ক্রমশঃ স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে যায় বেচারা। নিজস্ব উদ্দাম কণ্ঠে ঘোষণা করে — ওরা কে ? ওদের কি রাইট আছে বিনি চিকিচ্ছেয় মেরে ফেলবার ? মামী পেটে দশমাস জায়গা দিয়েছিলো বলেই কি মামীর মাথাটা কিনে রেখেছে ? ··· আমি দেখে নেবো কি করে মেরে ফেলে ওরা। খবর দেয়নি, জানতে দেয়নি। জানতে দেয়নি তাই মামাকে শেষ করতে পেরেছে —

ডাক্তার মৃদু আশ্বাসের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে যেতে বলেন ওকে।

ছেলেটাকে যামিনীমোহনের বাড়ীতে দেখছেন মাঝে মাঝে, কখনো গ্রাহ্য করেননি। এই নতুন পরিচয়ে চমৎকৃত হ'ন।

তেরো

এদিকে—

দিন কাটছে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে।

সংসার চলেছে নিজের তালে।

বড়ো বৌ প্রতিটি ফুটো পয়সার হিসেব কষে কষে টাকা জমান আর লুকিয়ে স্যাকরা ডেকে ভারী ভারী গহনা গড়িয়ে বাক্সে তুলে রাখেন, মেজবৌ, "টাকা জিনিশটা যে তাঁর কাছে খোলামকুচির সামিল ফিহাত এই কথাটি সাড়ম্বরে ঘোষণা করে করে, পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে পরেন নিত্যনতুন শাড়ী গহনা জামা জুতো, কেনেন হালফ্যাসানের ভালো ভালো আসবাব পত্র।

নির্ম্মল একান্ত নিষ্ঠায় যাতায়াত করতে থাকে মেজদার শ্বশুরবাড়ী।

কিছুদিন পরেই যেটা নিজের শ্বশুর বাড়ীতে পরিণত হতে পারবে।

গীতশ্রী অফিসটা বজায় রেখে বাকী সময়টুকু মা'র তদারকী করে।

সন্তোষিণী বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনির আশায় দিন গোনেন।……

বৈঠকখানা ঘর থেকে বড়ো ছেলের তাসের আড্ডার 'হররা' কানে আসে; আসে ওপর তলা থেকে মেজ বৌমার গানের আসরের সুর।…ছোট ছোট নাতি নাতনী গুলো দরজার গোড়ায় উঁকি ঝুঁকি মারে, আর সন্তোষিণী একটু ডাকলেই ছুটে পালায়।

গহনা কাপড়পরা হাস্যময়ী ঠাকুমা, আচার আমসত্ব মিষ্টান্নের অফুরন্ত ভাড়ারী ঠাকুমা ছিলেন তাদের কাছে যেমনই প্রীতিকর, তেমনই ভীতিকর এই অদ্ভুত সাজ করা শয্যাশায়িনী অশ্রুমুখী ঠাকুমা।

সংসারের বহুবিধ পরিবর্ত্তনে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোধকরি এই ছোটগুলো।

একে তো 'গোবিন্দকার' বিরহ তা'দের হৃদয় রাজ্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি, তার উপর সংসারের বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থাগুলোও কী বিশ্রী বিরক্তিকর!

রুণু দেবু খেতে বসবে একজায়গায় তোমনি চাঁদুকে বসতে হবে অন্যত্র। রুণু দেবুর খাদ্য শুকনো রুটি, আর মনি চাঁদুর খাদ্য লুচি সন্দেশ।

দু' পক্ষের পড়ার ঘর আলাদা, খেলার পার্ক আলাদা।

উভয় গৃহিণীর কড়া শাসন আছে চাকর বাকরের ওপর।

ওদের কাছে এ একটা অর্থহীন প্রহেলিকা।

এই নিস্তরঙ্গ সংসারযাত্রায় হঠাৎ একদিন একটা ঢিল পড়লো!

সে ঢিলটা হচ্ছে ডাক্তারবাবুর আকস্মিক আবির্ভাব।

সময়টা সকাল, তিনভাই বাড়ীতেই উপস্থিত। সহসা ডাক্তার দাশগুপ্তর পরিচিত বিরাট গাড়ীখানা দরজায় এসে দাঁড়াতেই থতমত খেয়ে গেলো ওরা।

তিনজনেই ভাবে ডাকলে কে? বড়দা? মেজদা?... নির্ম্মল? পরিমল?...

ব্যাপারটা কি? মায়ের ওপর হঠাৎ এতো দরদ? না কি ভাইদের ওপর টেক্কা দেওয়া? পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করতে থাকে।

যাই হোক তিনজনেই ত্রস্তব্যস্তে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ঢোকে রোগীর ঘরে।

পরিচিত ডাক্তার আগেও কতোবার চিকিৎসা করেছেন সন্তোষিণীকে, এক্ষেত্রে সন্তোষিণীকে দেখে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মার্জ্জিত ভাষায় এমন দু'একটি মন্তব্য করেন, যা সন্তোষিণীর ছেলেদের পক্ষে মোটেই গৌরবজনক নয়। শ্রুতিসুখকর তো নয়ই।

অসুখ?

অসুখ আবার কি?

চিকিৎসা? চিকিৎসা আর কিছুই নয়, চেঞ্জ!

চেঞ্জ চাই সব কিছুর। অবস্থার, ব্যবস্থার, খাওয়া হাওয়া সমস্তর।

—'হাওয়া বদল হলেই হলো' ভেবে যেন আবার কলকাতার বাড়ী থেকে দেশের বাড়ীতে ট্র্যান্সফার করবেন না—ডাক্তার ঠোঁটের কোনে হাসির আভাস এনে বলেন — দরকার বোধ করেন তো সমুদ্র তীরে বাড়ী দেখুন একটা, পুরী ওয়ালটেয়ার গোপালপুর যেখানে হোক।... নিদেন পক্ষে কাছেপিঠে দীঘায় চলে যান। সুন্দর জায়গা।

'দরকার বোধ' করুক না করুক মাথা হেঁট করে শোনে তিনজনেই।

গাড়ী পর্য্যন্ত তুলে দেবার সময় ইতস্তত করে তিনজনেই, ঠিক বুঝতে পারেনা ভিজিটটা দেবে কে? অথবা দিয়েছে কে? যে ডেকে এনেছে দেওয়া তারই তো উচিৎ। কোনো ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ পর্য্যন্ত না করে — যখন বাহাদুরী দেখানো হয়েছে।

অতঃপর ঘরের মধ্যে কর্ত্তার কাছে আস্ফালন করেন বড়োবৌ — আর কিছুই নয় এ হচ্ছে মেজগিন্নীর কারসাজি। ওই যে দিনরাত

নবাবী দেখান, ভাবটা যেন পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করে না, তাই সকলের ওপর এই টেক্কাটি দেওয়া হলো। তা' তুমিই বা সয়ে থাকবে কেন ভিজিটের টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ধরে দাওগে যাও, ছোট ঠাকুরপো দিক আর এক ভাগ, বাকী একভাগ থাকুক মেজ ঠাকুরপোর!

ওদিকে মেজগিন্নী অয়েনার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডারের তুলি বুলোতে বুলোতে স্বামীকে উদ্দেশ করে মুচকে হেসে বলেন — হঠাৎ বড়োগিন্নীর আঁচলের গেরোটা আলগা হয়ে গেলো কি করে বলোতো? নগদ বত্রিশ টাকা ফী দিয়ে ডাক্তার আনানো — সোজা কথা? ঝোঁকের মাথায় করে ফেলে শেষে না আফশোসে হার্টফেল্ করে বসেন! যাও যাও তুমি গোটা ষোলো অন্তত দিয়ে এসো। মাতো সকলেরই।

নির্ম্মল পুরোপুরি বত্রিশটা টাকাই পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বড়দা কি মেজদা কার হাতে গুঁজে দেবে বুঝে উঠতে পারে না। মনে ভাবে তারই উচিৎ ছিলো মায়ের জন্য ডাক্তারকে কল্ দিয়ে আসা।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কথা উঠতেই প্রত্যেকে অবাক!

কেউ ডাকেনি ডাক্তারকে।

কেউ দেয়নি টাকা।

তবে?

ডাক্তার নিজেই এলো নাকি? তাজ্জব ব্যাপার! ··· ওঃ নিশ্চয় গীতা! ডাকো তাকে?

গীতশ্রীও মনে মনে ভাবছিলো দাদাদের মধ্যে কে হঠাৎ এমন বদান্য হয়ে উঠলো ওদের প্রশ্ন শুনে চুপ হয়ে গেলো!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে স্থির স্বরে বললে — ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ছটফট করবার দরকার নেই বড়দা, আমি বুঝেছি কে দিয়েছে টাকা, কে দিয়ে এসেছে খবর।

— কে? কে?

— গোবিন্দদা!

গোবিন্দ!! শব্দটা যেন ওদের গালের ওপর চড় মাড়ে। তিনটি কণ্ঠ হ'তে একত্রে ধ্বনিত হয় — গোবিন্দ!!

— তার আবার এতো মুরোদ হলো কোথা থেকে?...

গীতশ্রী তেমনি ভাবে বলে — মুরোদ যে করে কোথা থেকে হয় বোঝা শক্ত মেজদা, বাবার শ্রাদ্ধের দিনের কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছো কোনোদিন? মা ইচ্ছে করে তোমাদের সভার মধ্যে অপদস্থ করবার ফন্দীতে ষড়যন্ত্র করে গোবিন্দদাকে আনিয়েছিলেন, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত আছো।

নির্ম্মল বলে — কিন্তু গোবিন্দদা তো এদিকও মাড়ায় না, ওকি করে জানছে মায়ের অসুখ? থাকে তো সেই কোন দূরে।

গীতশ্রী একবার চোখ তুলে একটু হাসে।

— দূরত্বটা কি শুধু গজ ফিতে মাইল দিয়েই মাপা যায় ছোড়দা? নাকি কাছাকাছি থাকাটাই 'কাছে' থাকার একমাত্র প্রমাণ?

অনুরাগে নয়, রাগে রাগে তোড়জোড় চলে মাকে হাওয়া বদলাতে পাঠাবার। কাজ কিছু না হোক কথা হয় বিস্তর। মাঝ মাঝে একত্রে তিন ভাইয়ের পদধূলি পড়ে মায়ের ঘরে।

কাজ কামাই করে কে মাকে নিয়ে অনিশ্চিত কালের জন্যে সমুদ্র তীরে বাস করতে যাবে এ প্রশ্ন সন্তোষিণীকেই করা হয়।

বেকার তো কেউ নয়!

মায় গীতা পর্য্যন্ত চাকরে। এক যদি বড়দিকে খবর দেওয়া হয়।

(ছাই ফেলবার দরকার হলেই তো ভাঙা কুলোর খোঁজ পড়ে।)

এক সময় সন্তোষিণী ক্লান্তস্বরে বলেন — আমাকে কোনোখানে পাঠাবার চেষ্টা তোমরা কোরোনা বাবা, কর্ত্তার তৈরি বাড়ীতে মরণকালটুকু পর্য্যন্ত থাকবার অধিকার আমার আইনে যদি নাও থাকে, দয়া করে থাকতে দিও।

— এটা তোমার রাগের কথা মা — সুবিমল নিজেই রাগতঃ স্বরে বলে — আমাদের অবস্থাটা তুমি বিবেচনা করোনা এই বড়ো দোষ! বাবার ওপরেও কখনো বিবেচনা করোনি, যখন যা খুশি —

সন্তোষিণী মৃদু দৃঢ় কণ্ঠে বলেন — তাঁর কথা থাক সুবিমল, তোমাদের কথাই হচ্ছে হোক। সমুদ্দুরের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে নতুন করে সেরে উঠে বেঁচে থাকবার দরকার আমার আর নেই বাবা। ··· চিরদিন যাঁর ওপর অবিবেচনা করে এসেছি, তাঁর পায়ের কাছে যেন তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি এই দিনরাত্তিরের প্রার্থনা আমার। ··· যদি সেখানে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

পরিমল এতোক্ষণ একটু পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলো, সেটা শেষ হতে ফেলে দিয়ে পায়ে চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে — ওসব সেন্টিমেণ্টের কথার তো কোনো মানে হয় না। ··· নেহাৎ গলায় দড়ি দিয়ে না ঝুললে, যার যতোদিন বাঁচবার বাঁচতেই হবে। বিছানায় পড়ে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকার চাইতে ভালো ভাবে বাঁচাই ভালো।

—মেজদা তোমাদের হিতোপদেশগুলো দয়া করে একটু কম করবে? গীতা বলে—বৌদিদের বলবার জন্যেও খানিকটা রাখো?··· দেখছোনা দরজায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন ওরা?

কথাটা মিথ্যা নয়, দুই বৌ দরজার কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। কারণটা বোধহয়, কর্ত্তারা আবার কেউ কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বড়োরকমের একটা ভার নিয়ে না বসেন সে সম্বন্ধে সচেতন করে রাখা।

কথা বার্ত্তা শুনে রাগে রাগে হাড় জ্বলে যাচ্ছে তাদের!

বুড়ো স্থুড়ো বিধবা মানুষের আবার সমুদ্রতীরে হাওয়া খেতে যাওয়া! শুনলে হাসি পায়। দেখুক না চারিদিকে তাকিয়ে, কোন সংসারে এমন বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটছে?

বড়ো ডাক্তারে অমন বড়ো বড়ো কথা বলেই থাকে, তাই শুনে যদি চলতে হয় তা' হলে আর গেরস্থ লোকে বাঁচে না।

শুনতে শুনতে একদিন কঠিন আদেশ দিয়ে বসেন সন্তোষিণী, এ বাড়ী থেকে তাঁকে নড়ানো চড়ানোর চেষ্টা যেন না হয়, এই বাড়ীতেই শেষ নিশ্বাস ফেলতে চান তিনি। এবং সেটা যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই মঙ্গল।

সন্তোষিণী 'মঙ্গল' বললে কি হবে, ওদিকে আর এক জনের যে আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে।

এখন আর লুকিয়ে চুরিয়ে নয় যখন তখনই উদভ্রান্তের মতো বাড়ীর সামনের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে গোবিন্দ। একদিন দেখা হয়

সুবিমলের সঙ্গে, আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করে — ডাক্তারবাবু কি বললেন বড়দা? মামী বাঁচবে তো?

সুবিমল বিরক্তভাবে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে — তা' সে কথা রাস্তায় মাঝখানে কেন?

গোবিন্দ হতাশ ভাবে বলে — তোমাদের আর কোথায় পাবো?

—কেন বাড়ী ছেড়ে চলে গেছি আমরা?

—বাড়ী? সে উপায় থাকলে কি আর — আমার মাথা খেয়ে মামী যে মাথায় দিব্যি দিয়ে বসে আছে।

সুবিমল বিদ্রূপহাস্যে ঠোঁট বাকিয়ে বলে—তাই তোমার প্রবেশ নিষেধ?...হুঁ:। বাঁদর কি আর, গাছে ফলে। ঢের ঢের মুখ্যু দেখেছি— সব সব অফিস টাইমে এখন তা তুই এরকম ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে! কি একটা কাজ কর্ম্ম ছিলো না?

— আছে, আজ যাইনি। আচ্ছা বড়া—

— কী মুস্কিল! হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুবিমল পা চালায় — মরবার সময় নেই।

গোবিন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সুবিমল কোঁচা সামলে পা চালায়।

বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে আর একদিন ধরে পরিমলকে।

— মেজদা ডাক্তার কি বলে গেলো?

ডাক্তার সংক্রান্ত ব্যাপারে অপদস্থ হয়ে গোবিন্দর ওপর হাড়ে চটে ছিলো পরিমল, উত্তরে ক্রুদ্ধস্বরে বলে—সে প্রশ্নটা স্বয়ং ডাক্তারকে গিয়েই করলে পারো? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে তো বেশ শিখেছো?

গোবিন্দ সকাতরে বলে—আমায় মাপ করো মেজদা, ভাবনায় চিন্তায় মাথার ঠিক ছিলো না—

— যথেষ্ট ঠিক আছে। বলি করা হচ্ছে কি আজকাল? টু পাইস উপরি টুপরি আছে বোধহয়? তাই নবাবী দেখিয়ে বেড়ানো হচ্ছে, কেমন? ওগুলো জায়গা বিশেষে করলেই ভালো হয় বুঝলে হে গোবিন্দবাবু? সব বিষয়ে আমাদের ওপর টেক্কা দিতে আসা, খুব সভ্যতার পরিচয় নয়।

মট্‌মটে স্যুট পরা পরিমল গট গট করে এগিয়ে যায় সামনের চলন্ত বাস্‌টা লক্ষ্য করে।

গোবিন্দ চেয়ে থাকে হাঁ করে।

মরিয়া হয়ে শেষ পর্য্যন্ত হাজির হয় গিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্তর কাছেই।

দু'দিন ফিরে গিয়ে গিয়ে অবশেষে দেখা হয়।

প্রশ্ন শুনে ডাক্তার কঠিন হাসি হেসে জবাব দেন — মরবার তাঁর আর বেশী দেরী নেই বাপু, নিশ্চিন্ত থাকোগে, যাও।

এরপর আর দাঁড়াতে পারেনি গোবিন্দ, ছুটে পালিয়েছে চোখের জল গোপন করতে।

চোদ্দো

কারখানার কাজে গাফিলি হ'তে থাকে ক্রমাগত।

সহকর্ম্মীরা অনুযোগ করে 'গোবিন্দর হলো কি!' একদিন কথায় কথায় স্নেহশীল মনিবের সঙ্গে হয়ে যায় বচসা। ··· গৌরী তো উঠতে বসতে বকুনি খেয়ে মরছে।

গোবিন্দ ছোটে কালীঘাটে, ঘোরে ছোট বড়ো নানা মন্দিরে। পূজো দেয়, মানত করে!

ডাক্তারে হাল ছাড়লে দেবতা ছাড়া আর ভরসা কোথায়?

এমনি একদিন খাবার সময় গৌরী বলে — দেখো পাশের বাড়ীর মাসীমা বলছিলেন ওঁর বাপের বাড়ীর দেশে নাকি 'যোগিনী মা' বলে কে একজন আছেন, শনি মঙ্গলবারে নাকি মা কালীর ভর হয় তাঁর ওপর।

গোবিন্দ ভাতের ওপর ডালের বাটিটা উপুড় করে দিয়ে বাটিট-ঠক্ করে মাটিতে বসিয়ে বলে — ডাকিনী যোগিনীর ওপর অমন মা কালীর 'ভর' হয়েই থাকে, শুনে আমার কি সগ্গো লাভ হবে?

আজকাল সর্ব্বদাই বিশ্বের বিরক্তি তার মনে।

গৌরী কুণ্ঠিতভাবে বলে — মাসীমা গল্প করছিলেন, সে সময় গিয়ে পড়তে পারলে নাকি তিনি মরাকে বাঁচাতে পারেন। কতো শক্ত শক্ত রুগী ভালো করছেন — শিবের অসাধ্য ব্যাধি তাঁর ওষুধে —

উৎকর্ণ গোবিন্দ হাতের ভাত ফেলে চমকে হাত গুটিয়ে বসে —

এই কথা শুনে 'চেপে' বসে আছো? ··· বলি কোথায় সে বাপের বাড়ী? কোন দেশে?

— কি জানি, 'সোনাভাঙা' না কি গাঁ, ছোট রেলগাড়ী চেপে বারো মাইল গিয়ে, আরও সাত মাইল গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। বলছিলেন রাস্তা নাকি খুব — ওকি? ওকি? খেলেনা? উঠে পড়লে যে? যাচ্ছো কোথায়?

গোবিন্দর ততক্ষণে হাত ধোয়া হয়ে গেছে। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়াচ্ছে।

গৌরীর ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রায় পথে বেরিয়ে — যাচ্ছি তোমার মাসীমার কাছে। সব জেনে নিইগে কালই তো শনিবার —

ক্ষ্যাপা গোবিন্দকে আর আটকানো যায় না। বেরিয়ে পড়ে পরদিন ভোরে।

শঙ্কাতুরা গৌরী একা বসে ভাবে — সেই তো 'উদোমাদা' 'আড় বুঝো' মানুষ। কেমন করে সেই অজানা অচেনা পথ পাড়ি দিয়ে ঠিকমত পৌঁছবে!

ওর বিরাট দেহখানার ভিতর অবস্থিত যে মানুষটা, সেটা যে নিতান্তই শিশুমাত্র, গৌরীর মতো এমন করে আর কে জানে?

রেল থেকে নেমে —

সাত মাইল পথ গোরুর গাড়ীতে।

গোরুর গাড়ী পাল্লা দিতে পারবে গোবিন্দর পায়ের সঙ্গে।

আর মনের সঙ্গে। সে কি রেলগাড়ীই পেরে উঠছিলো। কোথায় গরুরগাড়ী, কে খোঁজে। তা' ছাড়া গাড়ীর মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সে এক যমযন্ত্রণা ব্যাপার। তার চাইতে পা চালানো ভালো।

ঝোপ জঙ্গল খানা ডোবার গা দিয়ে দিয়ে মেঠো পথ। চলতে চলতে যা'কে পায় তাকেই প্রশ্ন করে — সোনাডাঙা কোন দিকে জানো। সোনাডাঙা। 'করাল ভৈরবী কালী' আছেন যেখানে। শনি মঙ্গলে যোগিনীমার 'ভর' হয় ?

কেউ বা বলতে পারে না, কেউ খানিকটা বুঝিয়ে দেয়।

এমনি এক সময় —

একটী শীর্ণা বিধবা বড়ো একটা পিতলের কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাট থেকে উঠতে থমকে দাঁড়ায়।

— কে কথা বলছে। গোবিন্দ।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে গোবিন্দর মুখ থেকে শুধু এইটুক বেরোয় —

— বড়দি।

— গোবিন্দ, তুই এখানে।

—আর তুমিই বা এখানে কেন? এই ভাগাড়ে? কি আছে তোমার এখানে? মুরলা ম্লানহেসে বলে — মরাগরুর ভাগাড় ছাড়া আর কোথায় ঠাঁই হবে? এই তো শ্বশুরবাড়ীর দেশ আমার। এখানেই আছি এখন।

তা হঠাৎ মরতে এখানে থাকতে এসেছো কেন ?

—মরণ নেই বলেই আসতে হয়েছে রে গোবিন্দ।

—ব্যাটা কোথায়? সুব্রতবাবু?

মুরলা বিষাদের হাসি হাসে — তাই যদি জানবো তবে আর আমার এ হাল কেন? শুনতে পাই কলকাতাতেই আছে, আছে ভালো। ফুর্ত্তিতে আছে।

—হুঁ! তা যাক, বাড়ী ছেড়ে হঠাৎ এ চুলোয় আসবার বুদ্ধি দিলে কে? চেহারা তো হয়েছে দুর্ভিক্ষের ক্যাঙালী। ... ছিঃ! ঝগড়া করে চলে আসা হয়েছে বুঝি ?

—ঝগড়া ? নাঃ ! মুরলা বলে — ভাই ভাজ বললে আর জায়গা হবেনা —

গোবিন্দ প্রায় মুখ খিঁচিয়ে বলে — বললে, আর অমনি পট পট্ করে চলে এলে !

—কি করবো বল ? স্বামী নেই, বাপ গেলেন, ছেলে বাউণ্ডুলে, ভাইদের কাছে কিসের জোর ? এখানে জ্ঞাতি ভাসুরের বাড়ী দাসী-বিত্তি কর্‌ছি আর দুটো ভাত খাচ্ছি—

গোবিন্দ প্রায় চীৎকার করে ওঠে — তা' খাবে বৈ কি ! মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কতো হবে ? …'ভাইদের কাছে কিসের জোর ? …কেন গোবিন্দ বলে যে একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ভাই ছিলো তা'র কথা মনে পড়েনি একবার ?

অকস্মাৎ চেষ্টাকৃত সমস্ত রূঢ়তা ভেদ করে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ে গোবিন্দর দুই চোখের কোল বয়ে।

চোখ মুছে বলে—বলে রেখো তোমার সেই ভাসুরকে ফেরার পথে নিয়ে যাবো তোমাকে আমি। গোবিন্দর যদি দুটো অন্ন জোটে — তবে তার দিদিরও —

মুরলার চোখও শুষ্ক ছিলোনা।

গোবিন্দকে অবহেলা হতশ্রদ্ধা উৎপীড়ন সব থেকে বেশী যে করেছে সে মুরলা !

— কিন্তু তুই এখানে কেন গোবিন্দ ?

—বড়দি, মামীর বড়ো অসুখ, বাঁচেনা। দৈব ওষুধ নিতে এসেছি। 'সোনাডাঙ্গা' জানো ? সোনাডাঙ্গার যোগিনী মা ?

মুরলা ভুরু কুঁচকে বলে — শুনেছি ! শুনেছি খুব নাম ডাক, তবে

নিয়ম কানুন বড্ডো নাকি কড়া! কিন্তু মাকে আর এখন মাদুলী কবচ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে কি হবে গোবিন্দ? মলেই তো হাড় ক'খানা জুড়োয়!

—বোকোনা বড়দি! মরা ফরা শুনলেই মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। ...এই চললাম আমি এখন ফেরার পথে নিয়ে যাবো তোমাকে। ...উঃ এই আধমুনে কলসীটা তোমার সেই ভাসুর ঠাকুরের মাথার ওপর ঠুকে বসিয়ে দিতে পারতাম — তবে আমার রাগ মিটতো!

মুরলাকে ফেরার সময় নিয়ে যাবার আশ্বাস দিলেও কথা রাখতে পারেনা গোবিন্দ।

অনেক ভীড় ঠেলে অনেক কাণ্ড করে যোগিনীমার কাছ থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে বলতে গেলে সন্ধ্যা হয়ে যায়. আর তিনি অদ্ভুত এক আদেশ দেন।

বলেন — যা ব্যাটা যা, খুব ভাগ্যি যে তুই আজ এসেছিস। আজ অমাবস্যা শনিবারের অমাবস্যার ওষুধ অব্যর্থ। তবে — একটা কাজ করতে হবে। এই শেকড় অমাবস্যা থাকতে রুগীর হাতে বেঁধে দিতে হবে। পথে যেতে — কাউকে ছুঁবিনা, হাত থেকে কোথাও নামাবিনা, গাড়ী, পালকী চড়বিনা। ...ওই পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে ভিজে মাথায় খালি পায়ে যাবি। ...নইলে ফল হবেনা।

মূর্খ গোবিন্দ সম্ভব অসম্ভব বোধের বালাই নেই।

নেই আসল নকল বিচারের বুদ্ধি।

সেই ভরা সন্ধ্যায় পানাপুকুরে স্নান করে এসে শিকড় হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে—অমাবস্যে কতোক্ষণ আছে মা?

—রাত্তির তিনটে অবধি।

তিনটে? ··· উনিশ মাইল পথ? ··· তাতে কি? পা কার? গোবিন্দর না? বৃথাই কি সে বুকের ওপর রোলার তুলেছিলো?

কিন্তু বড়দি?

আচ্ছা আজ থাক। গোবিন্দ তো আজই মরে যাচ্ছে না! কাল আসবে আবার।

অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকারে ছায়া মূর্ত্তির মতো ছুটে চলেছে গোবিন্দ।···

যেতে পৌঁছতে হবে! যেমন করেই হোক পৌঁছতে হবে রাত্রি তিনটের মধ্যে! ···

ঝোপ জঙ্গল খানা ডোবার পাশ কাটাতে কাটাতে আসে রেল-লাইনের ধার। ···

অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে নিশুতি গ্রামগুলো বসে আছে দূরে দূরে।···

চীৎকার করে ওঠে গ্রাম্য কুকুর। ···

চীৎকার করতে থাকে শৃগালের দল। ··· দূরে কোনখান থেকে কানে আসে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি ··· মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায় নিশাচর পাখী। ···

দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়।

রেললাইন শেষ হয় ··· আসে কলকাতার শহরতলী।

ক্ষীণ এক একটা আলোর রেখা নিয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে গ্যাস পোষ্ট। ...... কোথায় একটা ঘড়িতে বাজে ছুইয়ের ঘণ্টা!

এসে পড়ে কলকাতার সেরা সেরা পথ। ..

অবশেষে দেখা দেয় রায় বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের বিবাট তিনতলা বাড়ীখানা।

কিন্তু?

তারপব?

এতোক্ষণ তো এ খেয়াল ছিলোনা গোবিন্দর।

হায়! কোনো খেয়ালই কি ছিলো তার? ... শুধু খেয়াল ছিলো "পৌছতে হবে"। যে ক'রেই হোক পৌছতে হবে রাত্রি তিনটেব মধ্যে। শনিবার অমাবস্যার মাহেন্দ্রক্ষণ ব্যর্থ না যায়।

দরজার সামনে দাঁড়িযে বাঁ হাত দিয়ে কপালেব ঘাম মুছে এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়ায় গোবিন্দ।

অলঙ্ঘ্য দরজার চৌকাঠটা চোখের সামনে যেন উঁচু হতে হতে সমস্ত কপাট জোড়াটা ঢেকে ফেলতে চাইছে। ... তা'ছাড়া — আব সময়ই বা কতোটুকু?

কাকে ডাকবে?

কিভাবে বলবে?

আচ্ছা দরজা থাক, জানলাও কি অলঙ্ঘ্য? ... দুটো লোহার গরাদে চাড় দিয়ে বার করে আনা কি গোবিন্দর পক্ষে অসম্ভব?

হাতের ওষুধ নামাতে নেই? তা হোক। ... আর একটা হাত তো আছে। কার্ণিশের ওপর উঠে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে সজোর টান মারে গোবিন্দ লোহার গরাদেটা ধরে। ... একটার পর আ-

একটা ! ··· এইবার অনায়াসে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে গোবিন্দর বড়ো সড়ো দেহটাকে।

অদ্ভুত একটা শব্দে চমকে জেগে উঠে আলো জ্বেলেই স্তম্ভিত হয়ে যায় গীতশ্রী ! সন্তোষিণী ক্ষীণ প্রশ্ন করেন — কে ?

— গোবিন্দদা ! গীতশ্রী বজ্রাহতের মতো উচ্চারণ করে।

— হ্যাঁ হ্যাঁ থাম। ছুঁয়ে ফেলিসনি যেন। মামী জেগেছো ? ··· কই দেখি তোমার বাঁ হাতটা ? ··· এই যে ··· ব্যস ! ··· বাবাঃ ! মা কালী মুখ রেখেছেন। ···

দোতলার বড়ো ঘড়ির আওয়াজ আসে ··· ঢং ঢং ঢং !

শেষ রাত্রে বাড়ীতে একটা সোরগোল ওঠে ··· চোর চোর !

পাশের বাড়ীর বামুন ঠাকুর দেখেছে গরাদে ভাঙার কাণ্ড ! ··· অবশ্য আরো অনেক কিছুই দেখেছে সে তার উর্ব্বর কল্পনায়। ··· দেখেছে ··· 'সাজোয়ান' তিন তিনটে লোক ··· হাতে আগুনের পাতের মতো ঝকঝকে ছোরা। ··· জানলা দিয়ে ঢুকে ও বাড়ীর গিন্নীমাকে খুন করেছে তাতে আর সন্দেহ কি ?

চাপা গলায় ডাক দিয়েছে সে এ বাড়ীর বামুন ঠাকুরকে।

অতঃপর উঠে পড়েছে সকলেই। শেষ রাতের পাতলা ঘুম ভাঙতে দেরী লাগেনি।

দরজায় ধাক্কা পড়ে ঠক্ ঠক্।

ভয়ার্ত্ত নির্ম্মলের গলা শোনা যায় — গীতা ! গীতা !

ছেলে বৌ, বামুন-চাকর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে বন্ধ দরজার এদিকে।

গীতশ্রী দোর খুলে দাঁড়ায়।

—গীতা জেগেছিস তুই ? মা কি করছেন ? ···

হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে তিনভাই।

নির্ম্মল বলে— গীতা আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এ ঘরে চোর ঢুকেছে। অ্যাঁ ওই যে — ওই তো গরাদে ভাঙা — একি ? ও কে ?

সন্তোষিণীর বিছানার দিকে তাকিয়ে সকলেই যেন পাথর হয়ে যায়।

সন্তোষিণীর কোলের কাছে গোবিন্দ মুখ লুকিয়ে বসে!

তার গায়ের ওপর কৃশ হাতখানি রেখে সন্তোষিণী স্থির শান্ত স্বরে বলেন — চোর নয় নির্ম্মল, ডাকাত! আমি দরজা ডিঙোতে বারণ করে মাথার দিব্যি দিয়েছিলাম, ও তার শোধ নিয়ে জব্দ করেছে আমায়। ··· বাবা সুবিমল, ভেবেছিলাম বাঁচবার আমার আর দরকার নেই, দেখছি — বড়ো ভুল, বড়ো অন্যায় কথা ভেবেছি। বাঁচবার দরকার এখনো ফুরোয়নি আমার। ··· লজ্জার মাথা খেয়ে চাইছি — কোথায় তোদের ভালো ভালো ডাক্তার বদ্যি আছে ডেকে আন, সমুদ্দুরের হাওয়া খেতে পাঠাবি তো পাঠা। এই অবুঝ হতভাগাটার জন্তে সেরে না উঠে উপায় নেই আমার। ··· তোদের ওপর মিথ্যে অভিমানের বশে ওকে যদি মাতৃহীন করে যাই, মাথার ওপর বসে যিনি বিচার করছেন তিনি ক্ষমা করবেন না।